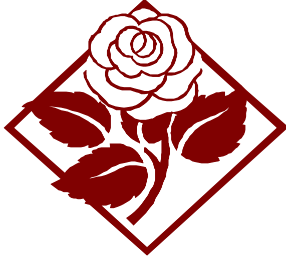




কুরবানীর বিধান

প্রণয়নে ঃ-

আব্দুল হামীদ মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم



ভূমিকা

إنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بالله منْ شُرُوْرِ أَنْفُسنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالنَا، مَنْ يَّهْده اللهُ فَلاَ مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْللْ فَلاَ هَادىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَة وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ منْهُمَا رجَالاً كَثيرًا وَنسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّـذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا}{يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاته وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُونَ}{يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَديدًا، يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا}

আম্মা বা’দ, আসলে এ পুস্তিকাটি ‘যুলহজ্জের তেরো দিন’ পুস্তিকার একটি অংশ। যাতে হজ্জ ও কুরবানীর কথা একত্রে থাকার কারণে অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী ভায়ের প্রস্তাব ছিল, দু’টিকে পৃথক ক’রে ছাপানোর ব্যবস্থা করা। বস্তুতঃ তাঁদেরই আশানুরূপ এই সংস্করণ।

আশা করি কুরবানীর বিধান মানতে ইচ্ছুক মুসলিমের জন্য অত্র পুস্তিকা একটি পাথেয় এবং সুন্দর উপহার হবে। মহান আল্লাহর কাছে আমার আকুল আবেদন যে, তিনি যেন আমার এই নগণ্য খিদমতকে কবুল করে নেন এবং কাল কিয়ামতে এর অসীলায় আমার, আমার পিতা-মাতা ও ওস্তাযগণের মুখ উজ্জ্বল করেন। আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
সন ২০০৯ইং

যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রত্যেক কাজ বা সৃষ্টি হিকমতে ভরপুর। প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর প্রতিপালকত্বের দলীল এবং একত্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান। তাঁর সকল কর্মেই পরিস্ফুটিত হয় তাঁর প্রত্যেক মহামহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত গুণ। কিছু সৃষ্টিকে কিছু মর্যাদা ও বিশেষ গুণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা, কিছু সময় ও স্থানকে অন্যান্যের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়ার কর্মও তাঁর ঐ হিকমত ও মহত্বের অন্যতম।

আল্লাহ পাক কিছু মাস, দিন ও রাত্রিকে অপরাপর থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; যাতে তা মুসলিমের আমল বৃদ্ধিতে সহযোগী হয়। তাঁর আনুগত্যে ও ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মঠ মনে নতুন কর্মোদ্যম পুনঃ পুনঃ জাগরিত হয়। অধিক সওয়াবের আশায় সেই কাজে মনের লোভ জেগে ওঠে এবং তার বড় অংশ হাসিলও করে থাকে বান্দা। যাতে মৃত্যু আসার পূর্বে যথা সময়ে তার প্রস্তুতি এবং পুনরুত্থানের জন্য যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারে।

শরীয়তে নির্দিষ্ট ইবাদতের মৌসম এই জন্যই করা হয়েছে যাতে ঐ সময়ে ইবাদতে অধিক মনোযোগ ও প্রয়াস লাভ হয় এবং অন্যান্য সময়ে অসম্পূর্ণ অথবা স্বল্প ইবাদতের পরিপূর্ণতা ও আধিক্য অর্জন এবং তওবা করার সুযোগ লাভ হয়।

ঐ ধরনের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ মৌসমেরই নির্দিষ্ট এক একটা অযীফাহ ও করণীয় আছে; যার দ্বারায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সেই সময়ে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা আছে; যার দ্বারায় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করে থাকেন। অতএব সৌভাগ্যশালী সেই হবে, যে ঐ নির্দিষ্ট মাস বা কয়েক ঘন্টার মৌসমে নির্দিষ্ট অযীফাহ ও ইবাদতের মাধ্যমে নিজ মওলার সামীপ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর সম্ভবতঃ তাঁর অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে পরকালে জাহান্নাম ও তাঁর ভীষণ অনলের কবল হতে নিষ্কৃতি পাবে।

আমল ও ইবাদতের নির্দিষ্ট মৌসমসমূহে আল্লাহর অনুগত ও দ্বীনদার বান্দা লাভবান হয় এবং অবাধ্য ও অলস বান্দা ক্ষতির শিকার হয়। তাই তো মুসলিমের উচিত, আয়ুর মর্যাদা ও জীবনের মূল্য সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত হওয়া এবং সেই সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত অধিকরূপে করা ও মরণাবধি সৎকার্যে অবিচল প্রতিষ্ঠিত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

((وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ))

অর্থাৎ, “তোমার ইয়াকীন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা কর।” *(কুঃ ১৫/৯৯)*

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন, ‘ইয়াকীন’ (সুনিশ্চয়তা) অর্থাৎ মৃত্যু। অনুরূপ বলেছেন মুজাহেদ, হাসান, কাতাদাহ প্রভৃতি মুফাস্‌সিরগণও। *(ইবনে কাষীর ৪/৩৭১)*

আল্লাহ আয্যা অজাল্ল যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন। “এই দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।” (সাহাবাগণ) বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। *(বুখারী, আবূ দাঊদ)*

তিনি আরো বলেন, “আযহার দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পবিত্রতর ও প্রতিদানে অধিক বৃহত্তর আর কোন আমল আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট নেই।” বলা হল, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?!’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন ব্যক্তির (আমল) যে নিজের জানমাল সহ বহির্গত হয়, অতঃপর তার কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না।” *(দারেমী ১/৩৫৭)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর আমলসমূহের কথা উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, “এই দশ দিন ছাড়া কোন এমন দিন নেই যাতে আমল অধিক উত্তম হতে পারে।” তাঁরা বললেন, ‘হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ?’ তিনি তার গুরুত্ব বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, “জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি যে নিজের জান-মাল সহ আল্লাহর রাস্তায় বের হয় এবং তাতেই তার জীবনাবসান ঘটে।” *(আহমদ, ইরওয়াউল গালীল ৩/৩৯৯)*

অতএব এই দলীলসমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, সারা বছরের সমস্ত দিনগুলি অপেক্ষা যুল হজ্জের ঐ দশ দিনই বিনা বিয়োজনে উত্তম। এমন কি রমযানের শেষ দশ দিনও ঐ দশ দিনের চেয়ে উত্তম নয়।

ইবনে কাষীর (রঃ) বলেন, ‘মোট কথা বলা হয়েছে যে, এই দশদিন সারা বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন; যেমনটি হাদীসের উক্তিতে প্রতীয়মান হয়। অনেকে রমযানের শেষ দশ দিনের উপরেও এই দিনগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, যে নামায,

রোযা, সাদকাহ ইত্যাদি আমল এই দিনগুলিতে পালনীয় ঐ আমলসমূহই ঐ দিনগুলিতেও পালনীয়। কিন্তু (যুলহজ্জের) ঐ দিনগুলিতে ফরজ হজ্জ আদায় করার অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।’

আবার অনেকে বলেছেন (রমযানের) ঐ দিনগুলিই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাতে রয়েছে শবেকদর, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

কিন্তু এই দুয়ের মধ্যবর্তী কিছু উলামা বলেন, (যিলহজ্জের) দিনগুলিই শ্রেষ্ঠ এবং রমযানের রাত্রিগুলি শ্রেষ্ঠ। অবশ্য এইভাবে সমস্ত দলীল সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর আল্লাহই বেশী জানেন। *(তফসীর ইবনে কাষীর ৫/৪১২)*

উক্ত দলীলসমূহ এই কথার প্রমাণ দেয় যে, প্রত্যেক নেক আমল (সৎকর্ম); যা এই দিনগুলিতে করা হয় তা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। অর্থাৎ, ঐ কাজই যদি অন্যান্য দিনে করা হয় তবে ততটা প্রিয় হয় না। আর যা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় তা তাঁর নিকট সর্বোত্তম। আবার এই দিনগুলিতে আমল ও ইবাদতকারী সেই মুজাহিদ থেকেও উত্তম, যে নিজের জান-মাল সহ জিহাদ করে বাড়ি ফিরে আসে।

অথচ বিদিত যে, আল্লাহর রাহে জিহাদ ঈমানের পর সর্বোৎকৃষ্ট আমল। যেহেতু আবূ হুরাইরাহ ؓ বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কোন আমল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান।” সে বলল, ‘তারপর কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ।” সে বলল, ‘তারপর কি?’ তিনি বললেন, “গৃহীত হজ্জ।” *(বুখারী ১৬নং)*

কিন্তু পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ হতে প্রতিপাদিত হয়েছে যে, বৎসরের অন্যান্য দিনের সকল প্রকার আমল অপেক্ষা যুলহজ্জের ঐ দশদিনের আমল আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম ও প্রিয়তম। সুতরাং ঐ দশ দিনের আমল যদিও জিহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়, তবুও অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর; যদিও বা সেই আমল (অন্যান্য দিনে) শ্রেষ্ঠ। আর নবী ﷺ কোন আমলকে ব্যতিক্রান্ত করেননি। তবে এমন এক জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন যা সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ; যাতে মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায় এবং আর ফিরে আসে না; যার ঐ আমল উক্ত দশ দিনের সমস্ত আমলের চেয়েও উত্তম।

কোন বস্তুকে যখন সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তখন তার এই অর্থ নয় যে, ঐ বস্তু সর্বাবস্থায় ও সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ। বরং অশ্রেষ্ঠও তার নির্দেশিত বিধিবদ্ধ স্থানে সাধারণ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হতে পারে। যেমন, জিহাদ সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ

আমল। কিন্তু অশ্রেষ্ঠ কোন নেক আমল তার নির্দেশিত নির্দিষ্ট ঐ দশ দিনে করা হলে তা জিহাদ থেকেও শ্রেষ্ঠতর।

অনুরূপভাবে, যেমন রুকু ও সিজদার মধ্যে তসবীহ পাঠ কুরআন পাঠ হতেও উত্তম। (বরং ঐ অবস্থায় কুরআন পাঠ অবৈধ।) অথচ কুরআন পাঠ সাধারণ সর্ববিধ তসবীহ ও যিক্র হতে উত্তম। *(ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৪/৩৬০, ফতহুল বারী ৬/৫)*

যুলহজ্জের এই দশ দিনের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রতিপন্ন হয়ঃ-

১। আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলির শপথ করেছেন। আর কোন জিনিসের নামে শপথ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ। আল্লাহ পাক বলেন, "শপথ ঊষার, শপথ দশ রজনীর----।" *(সূরা ফাজর ১-২ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ ইবনে যুবাইর ﷺ প্রভৃতি সলফগণ বলেন, 'নিশ্চয় ঐ দশ রাত্রি বলতে যুলহজ্জের দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।' ইবনে কাষীর বলেন, 'এটাই সঠিক।' শওকানী বলেন, 'এই অভিমত অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণের।' *(তফসীর ইবনে কাষীর, ফতহুল কাদীর ৫/৪৩২)*

অবশ্য ঐ দশ রাত্রি বলতে এই দশ দিনকেই নির্দিষ্ট করে বুঝার ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট হতে আসেনি; যা সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। যার জন্যই এই ব্যাখ্যায় মতান্তর সৃষ্টি হয়েছে, আর আল্লাহই এ বিষয়ে অধিক জানেন।

২। নবী ﷺ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এই দিনগুলি দুনিয়ার সর্বোকৃৎষ্ট দিন। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৩। তিনি এই দিনগুলিতে সৎকর্ম করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেহেতু এই দিনগুলি সকলের জন্য পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ এবং হাজীদের জন্য পবিত্রস্থানে (মক্কায়) আরো গুরুত্বপূর্ণ।

৪। তিনি এই দিনগুলিতে অধিকাধিক তসবীহ, তহমীদ, তহলীল ও তকবীর পড়তে আদেশ করেছেন। *(সহীহ তারগীব ১২৪৮-নং)*

৫। এই দিনগুলির মধ্যে আরাফাহ ও কুরবানীর দিন রয়েছে।

৬। এগুলির মধ্যেই কুরবানী ও হজ্জ করার মত বড় আমল রয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, 'একথা স্পষ্ট হয় যে, যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ; যেহেতু ঐ দিনগুলিতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে যেমন, নামায, রোযা, সদ্কাহ এবং হজ্জ। যা অন্যান্য দিনগুলিতে এইভাবে জমা হয় না। *(ফতহুল বারী ২/৪৬০)*

কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে কি করবে?

সুন্নাহতে এ কথা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে তার জন্য ওয়াজেব; যুলহজ্জ মাস প্রবেশের সাথে সাথে কুরাবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত সে যেন তার দেহের কোন লোম বা চুল, নখ ও চর্মাদি না কাটে। এ বিষয়ে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা যুলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ (কাটা) হতে বিরত থাকে।" অন্য এক বর্ণনায় বলেন, "সে যেন তার (মরা বা ফাটা) চর্মাদির কিছুও স্পর্শ না করে।" *(মুসলিম)*

বলিষ্ঠ মতানুসারে এখানে এ নির্দেশ ওয়াজেবের অর্থে এবং নিষেধ হারামের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, তা ব্যাপক আদেশ এবং অনির্দিষ্ট নিষেধ, যার কোন প্রত্যাহতকারীও নেই। *(তফসীর আযওয়াউল বায়ান ৫/৬৪০, আল-মুমতে ৭/৫২৯)* কিন্তু যদি কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছা করেই চুল-নখ কাটে, তবে তার জন্য জরুরী যে, সে যেন আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে। আর তার জন্য কোন কাফ্ফারা নেই। সে স্বাভাবিকভাবে কুরবানীই করবে। আবার প্রয়োজনে (যেমন নখ ফেটে বা ভেঙ্গে ঝুলতে থাকলে বা মাথায় জখমের উপর চুল থাকলে এবং ক্ষতির আশঙ্কা হলে) কেটে ফেলতে কোন দোষ নেই। কারণ, সে মুহরিম (যে হজ্জ বা ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে তার) অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার জন্য অসুবিধার ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডিত করাও বৈধ করা হয়েছে।

এই নির্দেশের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, কুরবানীদাতা কিছু আমলে মুহরিমের মতই। যেমন, কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা ইত্যাদি। তাই কুরবানীদাতাও মুহরিমের পালনীয় কিঞ্চিৎ কর্তব্য পালন করতে আদিষ্ট হয়েছে।

এমন কোন ব্যক্তি যার চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা ছিল না, সে চুল বা নখ কেটে থাকলে এবং তারপর কুরবানী করার ইচ্ছা হলে তারপর থেকেই আর তা কাটবে না।

কুরবানী করার জন্য যদি কেউ কাউকে ভার দেয় অথবা অসীয়ত করে, তবে সেও

নখ-চুল কাটবে না। অবশ্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অসী এই নিষেধের শামিল হবে না। অর্থাৎ তাদের জন্য নখ-চুল কাটা দূষণীয় নয়।

অনুরূপভাবে পরিবারের অভিভাবক কুরবানী করলে এই নিষেধাজ্ঞা কেবল তার পক্ষে হবে; বাকী অন্যান্য স্ত্রী-পুত্র বা আত্মীয়দেরকে শামিল হবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কুরবানী না থাকলে তারা নিজেদের চুল-নখ কাটতে পারে। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ বংশধরের তরফ থেকে কুরবানী করতেন অথচ তিনি তাদেরকে নখচুল কাটতে নিষেধ করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে পুনরায় হজ্জ করার নিয়ত করে (অর্থাৎ হজ্জও করে এবং পৃথকভাবে কুরবানীও করে) তবে ইহরাম বাঁধার পূর্বে (যুলহজ্জের চাঁদ উঠে গেলে) চুল-নখাদি কাটা উচিত নয়। যেহেতু তা প্রয়োজনে সুন্নত।

অবশ্য তামাত্তু হজ্জকারী (হজ্জের ওয়াজেব কুরবানী ছাড়া পৃথক কুরবানী দেওয়ার নিয়ত থাকলেও) উমরাহ শেষ করে চুল ছোট করবে। কারণ তা উমরার এক ওয়াজেব কর্ম। অনুরূপভাবে কুরবানীর দিনে পাথর মারার পর কুরবানী করার আগে মাথা নেড়া করতে পারে।

প্রকাশ যে, 'যারা কুরবানী দিতে পারে না তারা কুরবানীর দিনে নখ-চুল ইত্যাদি কাটলে তাদের কুরবানী করার সওয়াব লাভ হয়' এমন কথা এক হাদীসে থাকলেও তা সহীহ নয়। *(মিশকাত ১৪৭৯নং, যয়ীফ আবূ দাউদ ৫৯৫, যয়ীফ নাসাঈ ২৯৪, যয়ীফুল জামে' ১২৬৫নং)*

এই দশ দিনের অযীফাহ

এই দশ দিনকে সামনে পাওয়া বান্দার জন্য আল্লাহর তরফ হতে এক মহা অনুগ্রহ। মুত্তাকী ও নেক বান্দাগণই এই দিনগুলির যথার্থ কদর করে থাকেন। প্রতি মুসলিমের উচিত, এই সম্পদের কদর করা, এই সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিয়ে না দেওয়া এবং যত্নের সাথে বিভিন্ন ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে এই দিনগুলিকে অতিবাহিত করা।

এই দিনগুলিতে পালনীয় বড় বড় নেক আমল রয়েছে। মুসলিম সেই আমলসমূহের সাহায্যে বড় পুণ্যের অধিকারী হতে পারে। যেমনঃ-

১। রোযা পালন ঃ

যুল্ হজ্জের প্রথম নয়দিনে রোযা পালন করা মুসলিমের জন্য উত্তম। কারণ, নবী করীম ﷺ এই দিনগুলিতে নেক আমল করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর রোযা উত্তম আমলসমূহের অন্যতম; যা আল্লাহ পাক নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেন, "আদম সন্তানের প্রত্যেক কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।" *(বুখারী ১৮০৫, মুসলিম ১১৫১নং)*

প্রিয় নবী ﷺও এই নয় দিনে রোযা পালন করতেন। তাঁর পত্নী (হাফসাহ রাঃ) বলেন, "নবী ﷺ যুল হজ্জের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।" *(সহীহ আবূ দাউদ ২১২৯নং, নাসাঈ)*

বাইহাক্বী 'ফাযায়েলুল আওক্বাত' এ বলেন, এই হাদীসটি আয়েশা (রাঃ) এর ঐ হাদীস অপেক্ষা উত্তম যাতে তিনি বলেন, 'আমি রসূল ﷺ-কে (যুলহজ্জের) দশ দিনে কখনো রোযা রাখতে দেখিনি।' *(মুসলিম ১১৭৬নং)* কারণ, এ হাদীসটি ঘটনসূচক এবং তা আয়েশার ঐ অঘটনসূচক হাদীস হতে উত্তম। আর মুহাদ্দেসীনদের একটি নীতি এই যে, যখন ঘটনসূচক ও অঘটনসূচক দু'টি হাদীস পরস্পর-বিরোধী হয় তখন সমন্বয় সাধনের অন্যান্য উপায় না থাকলে ঘটনসূচক হাদীসটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ কেউ যদি কিছু ঘটতে না দেখে তবে তার অর্থ এই নয় যে, তা ঘটেই নি। তাই যে ঘটতে দেখেছে তার কথাটিকে ঘটার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

মোট কথা, যুলহজ্জ মাসের এই নয় দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। ইমাম নওবী বলেন, 'ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা পাকা মুস্তাহাব।' *(শারহুন নাওয়াবী ৮/৩২০)*

যদি কেউ যুলহজ্জের প্রথম তারীখ থেকে রোযা রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে অন্ততঃপক্ষে তাকে এ মাসের ৯ম তারীখে রোযা রাখতে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু রসূল ﷺ তার গুরুত্ব ও ফযীলতের উপর উম্মতকে বিশেষভাবে অবহিত ক'রে রোযা রাখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আরাফার দিন রোযা অতীত এক বছর ও আগামী এক বছরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।" *(মুসলিম ১১৬২নং)*

পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলিতে আরাফার দিন ১/২ দিন পরে হয়। সুতরাং ঐ সকল দেশের লোকেরা কোন্‌দিন আরাফার রোযা রাখবে? এ নিয়ে অবশ্য মতভেদ

রয়েছে। অতএব তারা যদি উক্ত নয় দিনই রোযা পালন করে, তাহলে উত্তম হয়। নচেৎ রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ এবং আল্লাহর নিচের আকাশে অবতরণ যেমন একই সময় সম্ভব নয়, অনুরূপ ঈদ ও আরাফা ইত্যাদির দিন একই দিন হওয়া জরুরী নয়। সকলেই সওয়াবের অধিকারী হবে ইন শাআল্লাহ।

২। তকবীর পাঠ ঃ-

এই দিনগুলিতে তকবীর, তহমীদ, তহলীল ও তসবীহ পাঠ করা সুন্নত এবং তা উচ্চস্বরে মসজিদে, ঘরে, পথে ও বাজারে এবং সেই সকল স্থানে যেখানে আল্লাহর যিক্র বৈধ - পাঠ করা মুস্তাহাব। এই তকবীর পুরুষরা উচ্চস্বরে বলবে এবং মহিলারা চুপেচুপে। যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত প্রচারিত হবে এবং ঘোষিত হবে তাঁর অনুপম তা'যীম। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ)

অর্থাৎ, "যাতে ওরা কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট জানা দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে- পশু হতে তিনি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছেন তার উপর --।" *(সূরা হজ্জ ২৮ আয়াত)*

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতার মতে 'নির্দিষ্ট জানা দিন' অর্থাৎ যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'নির্দিষ্ট জানা দিন' হল (যুলহজ্জের) দশ দিন এবং 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন' হল তাশরীকের কয়েকটি দিন।" *(বুখারী ২/৪৫৭)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট জানা দিন' অর্থাৎ তাশরীকের পূর্বের দিনগুলি; তারবিয়ার দিন এবং আরাফার দিন। আর 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন' অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলি।

আর এই মতই ইবনে কাষীর আবূ মূসা আশআরী, মুজাহিদ, ক্বাতাদা, আত্বা, সাঈদ বিন জুবাইর, হাসান, য্বাহহাক, আত্বা খুরাসানী, ইব্রাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, 'এই মত ইমাম শাফেয়ীর। আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হতে এটাই প্রসিদ্ধ।' *(তফসীর ইবনে কাষীর, আযওয়াউল বায়ান ৫/৪৯৭)*

সুতরাং এই কথার ভিত্তিতে আয়াত শরীফে উল্লেখিত আল্লাহর যিক্র (স্মরণ) করার অর্থ হবে, আল্লাহ পাক যে গবাদি পশু মানুষের রুযীরূপে দান করেছেন তার উপর তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া আদায় করা) এবং এতে তকবীর ও কুরবানী যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া শামিল হবে। তাই আল্লাহর যিক্র

বলতে কেবল যবেহকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করাই নয়। কারণ হজ্জে কুরবানী যবেহ করার দিন ঈদের দিন হতেই শুরু হয়। *(ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৪/২২৫)*

এই দিনগুলিতে পঠনীয় তকবীর নিম্নরূপঃ-

اَللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، وَللهِ الْحَمْد.

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লা-হিল হামদ।

এ ছাড়া অন্যান্যরূপেও তকবীর পাঠ করার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের জানা মতে রসূল ﷺ হতে কোন নির্দিষ্টরূপ তকবীর সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। যা কিছু এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে সবই সাহাবাগণের আমল। *(ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫)*

ইমাম সানআনী বলেন, 'তকবীরের বহু ধরন ও রূপ আছে, বহু ইমামগণও কিছু কিছুকে উত্তম মনে করেছেন। যা হতে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা আছে। আর আয়াতের সাধারণ বর্ণনা এটাই সমর্থন করে।' *(সুবুলুস সালাম ২/১২৫)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তকবীর এ যুগে প্রত্যাখ্যাত সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দশ দিনে তো অল্প কিছু মানুষ ব্যতীত আর কারো নিকট হতে তকবীর শুনাই যায় না। তাই উচ্চস্বরে তকবীর পড়া উচিত; যাতে সুন্নাহ জীবিত হয় এবং উদাসীনদের মনে সতর্কতা আসে।

পক্ষান্তরে এ কথা প্রমাণিত যে, ইবনে উমার ﷺ এবং আবূ হুরাইরা ﷺ এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চস্বরে) তকবীর পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তকবীরের সাথে তকবীর পাঠ করত। *(বুখারী)* অর্থাৎ, তাঁদের তকবীর পড়া শুনে লোকেরা তকবীর পড়তে হয় একথা স্মরণ করত এবং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক তকবীর পাঠ করত। তাঁরা একত্রিতভাবে একই সুরে সমস্বরে তকবীর পড়তেন না।

এই দিনগুলিতে সাধারণ তকবীর ও তসবীহ আদি যে কোন সময়ে দিনে বা রাতে অনির্দিষ্টভাবে ঈদের নামায পর্যন্ত পাঠ করতে হয়। আর নির্দিষ্ট তকবীর যা ফরয নামাযের জামাআতের পর (একাকী) পাঠ করা হয় আর তা অহাজীদের জন্য আরাফার (৯ম যুলহজ্জ) দিনের ফজর থেকে এবং মক্কা শরীফে হাজীদের জন্য কুরবানীর দিনের যোহর থেকে শুরু হয় এবং তাশরীকের শেষ দিনের (১৩ই যুল হজ্জের) আসর পর্যন্ত চলতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, বিলীন বা বিলীয়মান কোন সুন্নাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় আল্লাহর

নিকট মহা প্রতিদান ও বৃহত্তর সওয়াব রয়েছে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের মধ্যে কোন সুন্নত জীবিত করে যা আমার পরবর্তীকালে মৃত হয়ে পড়েছিল, তার জন্য সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব হবে, যে তার উপর আমল করে এবং তাদের কারো সওয়াব কিছুও কম করা হবে না।" *(তিরমিযী)*

৩। হজ্জ ও উমরাহ আদায় করা ঃ-

এই দশ দিনের মধ্যে হজ্জ আদায় করা সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম। অতএব যাকে আল্লাহপাক তাঁর গৃহের হজ্জ করার তওফীক দান করেছেন এবং যে যথার্থরূপে হজ্জ পালন করতে প্রয়াসী হয়, সে ইনশাআল্লাহ রসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণীতে তার মহাভাগ থাকবে, "মঞ্জুরকৃত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়।" যার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৪। কুরবানী করাঃ-

এই দশ দিনের করণীয় আল্লাহর নৈকট্যদানকারী আমলের মধ্যে কুরবানী করা অন্যতম। যার বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

৫। অন্যান্য নেক ও সৎকার্যে অধিক মনোযোগ দেওয়া ঃ-

এই দিনগুলিতে নেক আমল আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয়। আর তা হলে অবশ্যই এই দিনসমূহের কৃত আমলের মান ও মর্যাদা তাঁর নিকট অধিক। তাই মুসলিমের উচিত, যদি হজ্জ করা তার সামর্থ্য ও সাধ্যে না কুলায় তবে এই মূল্যবান সময়গুলিকে যেন সৎকার্য, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য; নফল নামায, তেলাঅত, যিকর, দুআ, দান, পিতামাতার অধিক খিদমত, আত্মীয়তা, সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দান, ইত্যাদি দ্বারা আবাদ করে। অন্ততঃপক্ষে ঐ দিনগুলিতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর এই কথা স্মরণ করা উচিত, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে (তসবীহ, তহলীল, তেলাঅত, ইল্‌ম বা দ্বীনী আলোচনায়) বসে এবং তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে তবে এক হজ্জ ও উমরার সমপরিমাণ তার সওয়াব লাভ হবে।" *(তিরমিযী)*

আল্লাহর তরফ হতে বান্দার জন্য এটা এক সুবৃহৎ অনুগ্রহ এবং অতিশয় কল্যাণ। যার অনুগ্রহ ও করুণার শেষ নেই, যা চিন্তা ও ধারণায় কল্পনা করা যায় না। যাতে অনুমিতিরও কোন স্থান নেই। যেহেতু তিনি পুরস্কর্তা ও অনুগ্রাহী। তাঁর

ইচ্ছামত তিনি যা দিয়ে, যাকে ইচ্ছা, যে কোন আমলের মাধ্যমে ইচ্ছা পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ রদ্দ করার কেউ নেই এবং কেউ তাঁর মঙ্গল ও অনুগ্রহকে রহিত করতে পারে না।

৬। বিশুদ্ধ তওবা করাঃ-

এই দশ দিনে মুসলিমদের জরুরী কর্তব্যের মধ্যে আল্লাহর নিকট তওবা করা, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াও উল্লেখ্য। তওবা হল- আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা; যে গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ ঘৃণা করেন সেই জিনিস হতে, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার প্রতি, বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করে, বর্তমানে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরপি তার প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে - ফিরে আসার নাম।

মুসলিমের জন্য ওয়াজেব; যখন সে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা অকস্মাৎ কোন পাপ করে বসে তখন শীঘ্রতার সাথে তওবার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা এবং এ কাজে গয়ংগচ্ছ অথবা ঢিলেমি না করা। কারণ, প্রথমতঃ সে জানে না যে, তাকে কোন ঘড়িতে মরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এক পাপ অপর পাপকে আকর্ষণ করে। তাই সত্বর তওবা না করলে হয়তো বা পাপের বোঝা নিয়েই মরতে হয় অথবা পাপের বোঝা আরো ভারি হতে থাকে।

গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ সময়কালে তওবার বড় গুণ থাকে। যেহেতু ঐ সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন আনুগত্য-প্রবণ থাকে এবং সৎকাজের প্রতি হৃদয় আকৃষ্যমাণ হয়। তখন হৃদয় অন্যায় ও পাপকে স্বীকার করতে চায় এবং কৃত পাপের উপর বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

যদিও তওবা করা এক প্রতিনিয়ত ওয়াজেব। তবুও যেহেতু তওবা করা আমল কবুল হওয়ার এবং আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করার হেতুসমূহের অন্যতম তথা পাপ দূরীকরণ ও মোচন হওয়ার কারণ; আবার ইবাদত আল্লাহর সান্নিধ্য ও ভালোবাসা লাভের হেতু সেহেতু মুসলিম যখন বিশুদ্ধ তওবার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মর্যাদাপূর্ণ আমল করে থাকে, তখন তার উভয়বিদ অতিরিক্ত কল্যাণ লাভ হয়; যা সফলতার প্রতি ঈঙ্গিত করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন,

{فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তওবাহ করে ও সৎকাজ করে, সে তো অচিরে সফলকাম হবে।" *(সূরা ক্বাস্বাস ৬৭ আয়াত)*

মুসলিম তওবা করবে পুরুষের মত। স্বামী সংসর্গ ত্যাগ করার উপর প্রসব বেদনাদগ্ধা নারীর মত তওবা করবে না। বরং তওবা করে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পক্ষান্তরে পাপ যদি সংসর্গ ও পরিবেশ-দোষে হয়, তাহলে সেই সংসর্গ ও পরিবেশ ত্যাগ করে সুন্দর নির্মল ইসলামী পরিবেশ গ্রহণ করবে এবং সৎলোকদের সংসর্গ গ্রহণ করে সৎকার্যে অবিচল থাকবে।

মুসলিমের উচিত, কল্যাণময় এই শ্রেণীর মৌসমের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া। কারণ, তা ক্ষণস্থায়ী। নিজের সংকট মুহূর্তে সাহায্য লাভের জন্য নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। যেহেতু পৃথিবীতে অবস্থান কাল অতি অল্প। কুচের সময় আসন্ন, পথ শঙ্কাপূর্ণ, যেথায় প্রবঞ্চনার আশঙ্কাই অধিক এবং বিপদের ভয় বড়। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সূক্ষ্ম ও সর্বদ্রষ্টা এবং তাঁরই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। আর "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দর্শন করবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকাজ করবে সে তাও দর্শন করবে।" *(সূরা যিলযাল ৭-৮-আয়াত)*

কুরবানীর প্রারম্ভিক ইতিহাস

কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সেই আদি পিতা আদম (عليه السلام)-এর যুগ থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদম (عليه السلام)-এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের কুরবানী পেশ করার কথা আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে জানতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ}

অর্থাৎ, আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। *(সূরা মাইদাহ ২৭ আয়াত)*

কুরবানীর বিধান প্রত্যেক জাতির জন্যই ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (٣٥)

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছি; যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর। আর সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে; যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। *(সূরা হাজ্জ ৩৪-৩৫)*

ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর কুরবানীর আদর্শ হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ {١٠٢} فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ {١٠٣} وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ {١٠٤} قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {١٠٥} إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ {١٠٦} وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ {١٠٧} وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨}

অর্থাৎ, অতঃপর সে (ইসমাঈল) যখন পিতা (ইব্রাহীমে)র সাথে চলা-ফিরার (কাজ করার) বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ।' সে বলল, 'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।' অনন্তর পিতা-পুত্র উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্য অধোমুখে শায়িত করল, তখন আমি ডেকে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে যবেহ করার জন্য এক মহান

জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিলাম। আর তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম। *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ১০২-১০৮ আয়াত)*

প্রকাশ যে, স্বপ্ন দেখে ইবরাহীম ﷺ-এর ৩ সকাল উঁট কুরবানী করার কথা শুদ্ধ নয়।

"ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
এই দিনই মিনা-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!"

কুরবানীর ফযীলত

'উয্‌হিয়্যাহ' কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ-যোগ্য উঁট, গরু, ছাগল বা ভেঁড়াকে বলা হয়। উক্ত শব্দটি 'যুহা' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ পূর্বাহ্ন। যেহেতু কুরবানী যবেহ করার উত্তম বা আফযল সময় হল ১০ই যুল্‌হজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল। তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে 'উয্‌হিয়্যাহ' বলা হয়েছে। যাকে 'যাহিয়্যাহ' বা 'আয্‌হাহ'ও বলা হয়। আর 'আয্‌হাহ' এর বহুবচন 'আয্‌হা'। যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে 'ঈদুল আয্‌হা'। বলা বাহুল্য, ঈদুযযোহা কথাটি ঠিক নয়।

কুরবানী শব্দটিও 'কুর্ব' ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ নৈকট্য। কুরবান হল, প্রত্যেক সেই বস্তু, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর সেখান থেকেই ফারসী বা উর্দু-বাংলাতে গৃহীত হয়েছে 'কুরবানী' শব্দটি।

কুরবানী করা কিতাব, সুন্নাহ ও সর্ববাদিসম্মতিক্রমে বিধেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

'অতএব তুমি নামায পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর। *(সূরা আস্‌র ২আয়াত)*

এই আয়াত শরীফে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ﷺ-কে নামায ও কুরবানী এই দু'টি ইবাদতকে একত্রিত করে পালন করতে আদেশ করেছেন। যে দু'টি বৃহত্তম

আনুগত্যের অন্যতম এবং মহোত্তম সামীপ্যদানকারী ইবাদত। আল্লাহর রসূল ﷺ সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুতরাং তিনি ছিলেন অধিক নামায কায়েমকারী ও অধিক কুরবানীদাতা। ইবনে উমর ؓ বলেন, "নবী ﷺ দশ বছর মদীনায় অবস্থানকালে কুরবানী করেছেন।" *(মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী)*

আনাস ؓ বলেন, 'রসূল ﷺ দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু'শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত (মেটে বা ছাই) রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।' *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি কোন বছর কুরবানী ত্যাগ করতেন না। *(যাদুল মাআদ ২/৩১৭)* যেমন তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা কুরবানী করতে উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর বাক্য দ্বারাও উদ্বুদ্ধ ও তাকীদ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করে সে নিজের জন্য যবেহ করে। আর যে নামাযের পরে যবেহ করে তার কুরবানী সিদ্ধ হয় এবং সে মুসলমানদের তরীকার অনুসারী হয়।" *(বুখারী ৫২২৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩২১, ইবনে মাজাহ ২/১০৪৪, হাকেম ২/৩৮৯)*

সকল মুসলিমগণ কুরবানী বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে একমত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। *(মুগনী ১৩/৩৬০, ফাতহুল বারী ১০/৩)*

তবে কুরবানী করা ওয়াজেব না সুন্নত -এ নিয়ে মতান্তর আছে। আর দুই মতেরই দলীল প্রায় সমানভাবে বলিষ্ঠ। যাতে কোন একটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজ নয়। যার জন্য কিছু সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্ ওলামা কুরবানী ওয়াজেব হওয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) অন্যতম। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফকীহগণের মতে কুরবানী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নত)। অবশ্য মুসলিমের জন্য মধ্যপন্থা এই যে, সামর্থ্য থাকতে কুরবানী ত্যাগ না করাই উচিত। [১] উচিত নিজের ও পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে কুরবানী করা। যাতে আল্লাহর আদেশ পালনে এবং মহানবী ﷺ-এর অনুকরণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

বস্তুতঃ কুরবানীতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের খাতে অর্থব্যয়

---

(১) *অপরের দান বা সহযোগিতা নিয়ে হজ্জ বা কুরবানী করলে তা পালন হয়ে যাবে এবং দাতা ও কর্তা উভয়েই সওয়াবের অধিকারী হবে। ঋণ করে কুরবানী দেওয়া জরুরী নয়। যেমন সামর্থ্যবান কোন অসী বা মুআক্কেলের কুরবানী যবেহ করলে, তার নিজের তরফ থেকে কুরবানী মাফ হয়ে যাবে না।*

(ও স্বার্থত্যাগ) হয়। যাতে তওহীদবাদীদের ইমাম ইব্রাহীম ﷺ-এর সুন্নাহ জীবিত হয়। ইসলামের একটি প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরিবার ও দরিদ্রজনের উপর খরচ করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করা হয়। এত কিছুর মাধ্যমে মুসলিম ঈদের খুশীর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করতে পেরেই মুসলিম আনন্দলাভ করতে পারে। সেই খুশীই তার আসল খুশী। রমযানের সারা দিন রোযা শেষে ইফতারের সময় তার খুশী হয়। পূর্ণ এক মাস রোযা করে সেই বিরাট আনুগত্যের মাধ্যমে ঈদের দিনে তারই আনন্দ অনুভব করে থাকে। এই খুশীই তার যথার্থ খুশী। বাকী অন্যান্য পার্থিব সুখ-বিলাসের খুশী খুশী নয়। বরং তা সর্বনাশের কদমবুসী। আল্লাহ পাক কিছু জাহান্নামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, "এ এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ প্রকাশ করতে।" *(সূরা মু'মিন ৭৫আয়াত)*

কারূনের পার্থিব উৎফুল্লতা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, "স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, (দর্পময়) আনন্দ করো না। অবশ্যই আল্লাহ (দর্পময়) আনন্দকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" *(সূরা ক্বাসাস ৭৬ আয়াত)*

অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, যেমন হজ্জ না করে তার খরচ সদকাহ করলে ফরয আদায় হয় না, তেমনি কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করে অভীষ্ট সুন্নত আদায় হয় না। যেহেতু যবেহ হল আল্লাহর তা'যীম-সম্বলিত একটি ইবাদত এবং তাঁর দ্বীনের এক নিদর্শন ও প্রতীক। আর মূল্য সদকাহ করলে তা বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে কুরবানী নবী ﷺ-এর সুন্নাহ এবং সমগ্র মুসলিম জাতির এক আমল। আর কোথাও কথিত নেই যে, তাঁদের কেউ কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য সদকাহ করেছেন। আবার যদি তা উত্তম হত, তাহলে তাঁরা নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম করতেন না। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/৩০৪)*

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, 'যবেহ তার স্বস্থানে কুরবানীর মূল্য সদকাহ করা অপেক্ষা উত্তম। যদিও সে মূল্য কুরবানীর চেয়ে পরিমাণে অধিক হয়। কারণ, আসল যবেহই উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট। যেহেতু কুরবানী নামাযের সংযুক্ত ইবাদত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, **(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).**

অর্থাৎ, অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় ও কুরবানী কর। *(সূরা আস্র)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

(قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ).

অর্থাৎ, বল, অবশ্যই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। *(সূরা আনআম ১৬২ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ধর্মাদর্শে নামায ও কুরবানী আছে; যার বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না। আর এই জন্যই যদি কোন হাজী তার তামাত্তু' বা ক্বিরান হজ্জের কুরবানীর বদলে তার তিনগুণ অথবা তার থেকে বেশী মূল্য সদকাহ করে তবে তার পরিবর্ত হবে না। অনুরূপভাবে কুরবানীও। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(তুহফাতুল মাওদূদ ৩৬পৃঃ)*

আরো জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, মূলতঃ কুরবানী যথাসময়ে জীবিত ব্যক্তির তরফ থেকেই প্রার্থনীয়। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে তার সওয়াবে জীবিত অথবা মৃত আত্মীয়-স্বজনকেও শরীক করতে পারে। যেহেতু নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবৃন্দ ﷺ নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের তরফ থেকে কুরবানী করতেন।

একাধিক মৃতব্যক্তিকে একটি মাত্র কুরবানীর সওয়াবে শরীক করাও বৈধ; যদি তাদের মধ্যে কারো উপর কুরবানী ওয়াজেব (নযর) না থাকে তবে। রসূল ﷺ নিজের তরফ থেকে, পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে এবং সেই উম্মতের তরফ থেকে কুরবানী করেছেন; যারা আল্লাহর জন্য তওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাঁর জন্য রিসালাত বা প্রচারের সাক্ষ্য দিয়েছে। *(মুসনাদ আহমাদ ৬/৩৯১-৩৯২, বাইহাকী ৯/২৬৮)* আর বিদিত যে, ঐ সাক্ষ্য প্রদানকারী কিছু উম্মত তাঁর যুগেই মারা গিয়েছিল। অতএব একই কুরবানীতে কেউ নিজ মৃত পিতামাতা ও দাদা-দাদীকেও সওয়াবে শামিল করতে পারে।

মৃতব্যক্তির তরফ থেকে পৃথক কুরবানী করার কোন দলীল নেই। তবে করা যায়। যেহেতু কুরবানী করা এক প্রকার সদকাহ। আর মৃতের তরফ থেকে সদকাহ করা সিদ্ধ; যা যথাপ্রমাণিত এবং মৃতব্যক্তি তার দ্বারা উপকৃতও হবে - ইনশাআল্লাহ। পরন্তু মৃতব্যক্তি এই শ্রেণীর পুণ্যকর্মের মুখাপেক্ষীও থাকে।

তবুও একটি কুরবানীকে নিজের তরফ থেকে না দিয়ে কেবলমাত্র মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয় এবং এতে আল্লাহ তাআলার সীমাহীন করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। বরং উচিত এই যে, নিজের নামের সাথে জীবিত-মৃত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনকে কুরবানীর নিয়তে শামিল করা। যেমন আল্লাহর নবী ﷺ

কুরবানী যবেহ করার সময় বলেছেন, 'হে আল্লাহ! এ (কুরবানী) মুহাম্মদের তরফ থেকে এবং মুহাম্মদের বংশধরের তরফ থেকে।' সুতরাং তিনি নিজের নাম প্রথমে নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বংশধরদেরকেও তার সওয়াবে শরীক করেছেন।

পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তি যদি তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কাউকে কুরবানী করতে অসীয়ত করে যায়, অথবা কিছু ওয়াক্‌ফ করে তার অর্জিত অর্থ থেকে কুরবানীর অসীয়ত করে যায়, তবে অসীর জন্য তা কার্যকর করা ওয়াজেব। কুরবানী না করে ঐ অর্থ সদকাহ খাতে ব্যয় করা বৈধ নয়। কারণ, তা সুন্নাহর পরিপন্থী এবং অসিয়তের রূপান্তর। অন্যথা যদি কুরবানীর জন্য অসিয়তকৃত অর্থ সংকুলান না হয়, তাহলে দুই অথবা ততোধিক বছরের অর্থ একত্রিত করে কুরবানী দিতে হবে। অবশ্য নিজের তরফ থেকে বাকী অর্থ পূরণ করে কুরবানী করলে তা সর্বোত্তম। মোটকথা অসীর উচিত, সূক্ষ্মভাবে অসীয়ত কার্যকর করা এবং যাতে মৃত অসিয়তকারীর উপকার ও লাভ হয় তারই যথার্থ প্রয়াস করা।

জ্ঞাতব্য যে, রসূল ﷺ কর্তৃক আলী ؓ-কে কুরবানীর অসিয়ত করার হাদীসটি যয়ীফ। *(যআদাঃ ৫৯৬নং, যতিঃ ২৫৫নং, যইমাঃ ৬৭২নং, মিঃ ১৪৬২নং হাদীসের টীকা দ্রঃ)* পরন্তু নবীর নামে কুরবানী করা আমাদের জন্য বিধেয় নয়। তিনি ঈসালে-সওয়াবের মুখাপেক্ষীও নন।

উল্লেখ্য যে, মুসাফির হলেও তার জন্য কুরবানী করা বিধেয়। আল্লাহর রসূল ﷺ মিনায় থাকাকালে নিজ স্ত্রীগণের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন। *(বুখারী ২৯৪, ৫৫৪৮, মুসলিম ১৯৭৫নং, বাইহাকী ৯/২৯৫)*

কুরবানীর মাহাত্ম্য সংক্রান্ত প্রচলিত কতিপয় অচল হাদীস

১। কুরবানীর জানোয়ার কিয়ামতের দিন তার শিং ও পশম এবং খুরসহ অবশ্যই হাজির হবে---। *(যয়ীফ, যয়ীফ তারগীব ৬৭১নং)*

২। কুরবানী তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নত। তার প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে রয়েছে একটি করে নেকী। *(হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭২নং)*

৩। কুরবানীর প্রথম বিন্দু রক্তের সাথে পূর্বেকার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়। পশুটিকে তার রক্ত ও মাংসসহ দাঁড়িপাল্লাতে ৭০ গুণ ভারী করে দেওয়া

হবে। *(হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭৪-৬৭৫নং)*

৪। ভালো মনে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করলে তা জাহান্নাম থেকে পর্দার মত হবে। *(হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭৭নং)*

৫। তোমরা তোমাদের কুরবানীকে মোটা-তাজা কর। কারণ তা তোমাদের পুলসিরাত পারের সওয়ারী। *(অতি দুর্বল, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১২৫৫নং)*

কুরবানীর আহকাম

কুরবানী করা আল্লাহর এক ইবাদত। আর কিতাব ও সুন্নায় এ কথা প্রমাণিত যে, কোন আমল নেক, সালেহ বা ভালো হয় না, কিংবা গৃহীত ও নৈকট্যদানকারী হয় না; যতক্ষণ না তাতে দু'টি শর্ত পূরণ হয়েছে;

প্রথমতঃ- ইখলাস। অর্থাৎ, তা যেন খাঁটি আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়। তা না হলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। যেমন কাবীলের নিকট থেকে কুরবানী কবুল করা হয়নি এবং তার কারণ স্বরূপ হাবীল বলেছিলেন,

{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (٢٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ তো মুত্তাক্বী (পরহেযগার ও সংযমী)দের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। *(সূরা মাইদাহ ২৭ আয়াত)*

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} (٣٧) سورة الحـــج

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া (সংযমশীলতা); এভাবে তিনি ওগুলিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীলদেরকে। *(সূরা হাজ্জ ৩৭ আয়াত)*

দ্বিতীয়তঃ- তা যেন আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَداً)

অর্থাৎ, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

সুতরাং যারা কেবল বেশী করে গোশ্ত্ খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী দেয় অথবা লোক সমাজে নাম কুড়াবার উদ্দেশ্যে মোটা-তাজা অতিরিক্ত মূল্যের পশু ক্রয় করে এবং তা প্রদর্শন ও প্রচার করে থাকে তাদের কুরবানী যে ইবাদত নয়-তা বলাই বাহুল্য। গোশ্ত্ খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে বলেই লোকে একই মূল্যের একটি গোটা কুরবানী না দিয়ে একটি ভাগ দিয়ে থাকে। বলে, একটি ছাগল দিলে দু'দিনেই শেষ হয়ে যাবে। লোকের ছেলেরা খাবে, আর আমার ছেলেরা তাকিয়ে দেখবে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

কুরবানীর শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে ঃ-

১। কুরবানীর পশু যেন সেই শ্রেণী বা বয়সের হয় যে শ্রেণী ও বয়স শরীয়ত নির্ধারিত করেছে। আর নির্ধারিত শ্রেণীর পশু চারটি; উঁট, গরু, ভেঁড়া ও ছাগল। অধিকাংশ উলামাদের মতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কুরবানী হল উঁট, অতঃপর গরু, তারপর মেষ (ভেঁড়া), তারপর ছাগল। আবার নর মেষ মাদা মেষ অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এ প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত হয়েছে। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/৬৩৪)*

একটি উঁট অথবা গরুতে সাত ব্যক্তি কুরবানীর জন্য শরীক হতে পারে। *(মুসলিম ১৩১৮নং)* অন্য এক বর্ণনামতে উঁট কুরবানীতেও দশ ব্যক্তি শরীক হতে পারে। ইমাম শওকানী বলেন, হজ্জের কুরবানীতে দশ এবং সাধারণ কুরবানীতে সাত ব্যক্তি শরীক হওয়াটাই সঠিক। *(নাইলুল আওত্বার ৮/১২৬)*

কিন্তু মেষ বা ছাগে ভাগাভাগি বৈধ নয়। তবে তার সওয়াবে একাধিক ব্যক্তিকে শরীক করা যাবে। সুতরাং একটি পরিবারের তরফ থেকে মাত্র একটি মেষ বা ছাগ যথেষ্ট হবে। তাতে সেই পরিবারের লোক-সংখ্যা যতই হোক না কেন।

কিন্তু উঁট বা গরুর এক সপ্তাংশ একটি পরিবারের তরফ থেকে যথেষ্ট হবে কি? এ নিয়ে উলামাগণের মাঝে মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেন, যথেষ্ট নয়। কারণ, তাতে ৭ জনের অধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া বৈধ নয়। তা ছাড়া পরিবারের তরফ থেকে একটি পূর্ণ 'দম' (জান) যথেষ্ট হবে। আর ৭ ভাগের ১ ভাগ পূর্ণ দম নয়। *(ফাতাওয়া*

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ৬/১৪৯)

অনেকের মতে একটি মেষ বা ছাগের মতই এক সপ্তাংশ উঁট বা গরু যথেষ্ট হবে। *(মাজালিসু আশরি যিলহাজ্জাহ, শুমাইমিরী, ২৬পৃঃ আল-মুমতে' ইবনে উসাইমীন ৭/৪৬২-৪৬৩)*

বলা বাহুল্য, একটি পরিবারের তরফ থেকে এক বা দুই ভাগ গরু কুরবানী দেওয়ার চাইতে ১টি ছাগল বা ভেঁড়া দেওয়াটাই অধিক উত্তম।

কুরবানীর সাথে একটি ভাগ আকীকার উদ্দেশ্যে দেওয়া যথেষ্ট নয়। যেমন যথেষ্ট নয় একটি পশু কুরবানী ও আকীকার নিয়তে যবেহ করা। কুরবানী ও আকীকার জন্য পৃথক পৃথক পশু হতে হবে। অবশ্য যদি কোন শিশুর আকীকার দিন কুরবানীর দিনেই পরে এবং আকীকা যবেহ করে, তাহলে আর কুরবানী না দিলেও চলে। যেমন, দুটি গোসলের কারণ উপস্থিত হলে একটি গোসল করলেই যথেষ্ট, জুমআর দিনে ঈদের নামায পড়লে আর জুমআহ না পড়লেও চলে, বিদায়ের সময় হজ্জের তওয়াফ করলে আর বিদায়ী তওয়াফ না করলেও চলে, যোহরের সময় মসজিদে প্রবেশ করে যোহরের সুন্নত পড়লে পৃথক করে আর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে হয় না এবং তামাত্তু হজ্জের কুরবানী দিলে আর পৃথকভাবে কুরবানী না দিলেও চলে। *(মানারুস সাবীল ১/২৮০)*

বয়সের দিক দিয়ে উঁটের পাঁচ বছর, গরুর দুই বছর এবং মেষ ও ছাগের এক বছর হওয়া জরুরী। অবশ্য অসুবিধার ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী মেষ কুরবানী করা যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "দাঁতালো ছাড়া যবেহ করো না। তবে তা দুর্লভ হলে ছয় মাসের মেষ যবেহ কর।" *(মুসলিম ১৯৬৩নং)*

কিন্তু উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, ছ'মাস বয়সী মেষের কুরবানী সিদ্ধ হবে; তা ছাড়া অন্য পশু পাওয়া যাক অথবা না যাক। অধিকাংশ উলামাগণ ঐ হাদীসের আদেশকে 'ইস্তিহবাব' (উত্তম) বলে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, ঐ হাদীসের মর্মার্থ এ নয় যে, অন্য কুরবানীর পশু না পাওয়া গেলে তবেই ছ'মাস বয়সের মেষশাবকের কুরবানী বৈধ। যেহেতু এমন অন্যান্য দলীলও রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ বয়সী মেষেরও কুরবানী বৈধ; প্রকাশতঃ যদিও কুরবানীদাতা অন্য দাঁতালো পশু পেয়েও থাকে। যেমন রসূল ﷺ বলেন, "ছ'মাস বয়সী মেষশাবক উত্তম কুরবানী।" *(মুসনাদে আহমাদ ২/৪৪৫, তিরমিযী)*

উক্ববাহ বিন আমের ؓ বলেন, (একদা) নবী ﷺ কুরবানীর পশু বিতরণ করলেন। উকবার ভাগে পড়ল এক ছয় মাসের মেষ। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর

রসূল! আমার ভাগে ছয় মাসের মেষ হল?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "এটা দিয়েই তুমি কুরবানী কর।" *(বুখারী ২১৭৮, মুসলিম ১৯৬৫নং)*

২। পশু যেন নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত হয়;

(ক) এক চোখে স্পষ্ট অন্ধত্ব। (খ) স্পষ্ট ব্যাধি। (গ) স্পষ্ট খঞ্জতা। (ঘ) অন্তিম বার্ধক্য। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চার রকমের পশু কুরবানী বৈধ বা সিদ্ধ হবে না; (এক চক্ষে) স্পষ্ট অন্ধত্বে অন্ধ, স্পষ্ট রোগা, স্পষ্ট খঞ্জতায় খঞ্জ এবং দুরারোগ্য ভগ্নপদ।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

অতএব এই চারের কোন এক ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হয় না। ইবনে কুদামাহ বলেন, 'এ বিষয়ে কোন মতভেদ আমরা জানি না।' *(মুগনী ১৩/৩৬৯)*

ত্রুটিগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ-

(ক) স্পষ্ট কানা (এক চক্ষের অন্ধ) যার একটি চক্ষু ধ্বসে গেছে অথবা বেরিয়ে আছে। দৃষ্টিহীন হলে তো অধিক ত্রুটি হবে। তবে যার চক্ষু সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট হয়নি তার কুরবানী সিদ্ধ হবে। কারণ, তা স্পষ্ট কানা নয়।

(খ) স্পষ্ট রোগের রোগা; যার উপর রোগের চিহ্ন প্রকাশিত। যে চরতে অথবা খেতে পারে না; যার দরুন দুর্বলতা ও মাংসবিকৃতি হয়ে থাকে। তদনুরূপ চর্মরোগও একটি ত্রুটি; যার কারণে চর্বি ও মাংস খারাপ হয়ে থাকে। তেমনি স্পষ্ট ক্ষত একটি ত্রুটি; যদি তার ফলে পশুর উপর কোন প্রভাব পড়ে থাকে।

গর্ভধারণ কোন ত্রুটি নয়। তবে গর্ভপাত বা প্রসবের নিকটবর্তী পশু একপ্রকার রোগগ্রস্ত এবং তা একটি ত্রুটি। যেহেতু গাভীন পশুর গোশ্ত্ অনেকের নিকট অরুচিকর, সেহেতু জেনেশুনে তা ক্রয় করা উচিত নয়। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট বা ক্রয় করার পর গর্ভের কথা জানা গেলে তা কুরবানীরূপে যথেষ্ট হবে। তার পেটের বাচ্চা খাওয়া যাবে। জীবিত থাকলে তাকে যবেহ করতে হবে। মৃত হলে যবেহ না করেই খাওয়া যাবে। কেননা, মায়ের যবেহতে সেও হালাল হয়ে যায়। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, দারাকুত্বনী, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৩৪৩১নং)* কারো রুচি না হলে সে কথা ভিন্ন।

(গ) দুরারোগ্য ভগ্নপদ। (ঘ) দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কারণে যার চর্বি ও মজ্জা নষ্ট অথবা শুষ্ক হয়ে গেছে।

উল্লেখিত হাদীস শরীফটিতে উপরোক্ত ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানী সিদ্ধ নয় বলে

বিবৃত হয়েছে এবং বাকী অন্যান্য ত্রুটির কথা বর্ণনা হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ উলামাগণের মতে, যদি ঐ ত্রুটিসমূহের অনুরূপ বা ততোধিক মন্দ ত্রুটি কোন পশুতে পাওয়া যায় তাহলে তাতেও কুরবানী সিদ্ধ হবে না; যেমন, দুই চক্ষের অন্ধ বা পা কাটা প্রভৃতি। *(শারহুন নওবী ১৩/২৮)*

খাত্ত্বাবী (রঃ) বলেন, হাদীসে এ কথার দলীল রয়েছে যে, কুরবানীর পশুতে সামান্য ত্রুটি মার্জনীয়। যেহেতু হাদীসের বক্তব্য, "স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগা, স্পষ্ট খঞ্জ" অতএব ঐ ত্রুটির সামান্য অংশ অস্পষ্ট হবে এবং তা মার্জনীয় ও অধর্তব্য হবে। *(মাআলিমুস সুনান ৪/১০৬)*

পক্ষান্তরে আরো কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে যাতে কুরবানী সিদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তা মকরূহ বলে বিবেচিত হয়। তাই এ জাতীয় ত্রুটি থেকেও কুরবানীর পশুকে মুক্ত করা উত্তম।

যে ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানী মকরূহ তা নিম্নরূপ ঃ-

১। কান কাটা বা শিং ভাঙ্গা। এর দ্বারা কুরবানী মকরূহ। তবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, এতে মাংসের কোন ক্ষতি বা কমি হয় না এবং সাধারণতঃ এমন ত্রুটি পশুর মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু যে পশুর জন্ম থেকেই শিং বা কান নেই তার দ্বারা কুরবানী মকরূহ নয়। যেহেতু ভাঙ্গা বা কাটাতে পশু রক্তাক্ত ও ক্লিষ্ট হয়; যা এক রোগের মত। কিন্তু জন্ম থেকে না থাকাটা এ ধরনের কোন রোগ নয়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ পশুই আফযল।

২। লেজ কাটা। যার পূর্ণ অথবা কিছু অংশ লেজ কাটা গেছে তার কুরবানী মকরূহ। ভেড়ার পুচ্ছে মাংসপিণ্ড কাটা থাকলে তার কুরবানী সিদ্ধ নয়। যেহেতু তা এক স্পষ্ট কমি এবং ঈপ্সিত অংশ। অবশ্য এমন জাতের ভেঁড়া যার পশ্চাতে মাংস পিণ্ড হয় না তার দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ।

৩। কান চিরা, দৈর্ঘ্যে চিরা, পশ্চাৎ থেকে চিরা, সম্মুখ থেকে প্রস্থে চিরা, কান ফাটা ইত্যাদি।

৪। লিঙ্গ কাটা। অবশ্য মুষ্ক কাটা মকরূহ নয়। যেহেতু খাসীর দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও মাংস উৎকৃষ্ট হয়।

৫। দাঁত ভাঙ্গা ও চামড়ার কোন অংশ অগভীর কাটা বা চিরা ইত্যাদি।

কুরবানী সিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় শর্ত হল মালিকানা। অর্থাৎ, কুরবানীদাতা যেন বৈধভাবে ঐ পশুর মালিক হয়। সুতরাং চুরিকৃত, আত্মসাৎকৃত অথবা অবৈধ ক্রয়-

বিক্রয়ে ক্রীত পশুর কুরবানী সিদ্ধ নয়। তদনুরূপ অবৈধ মূল্য (যেমন সূদ, ঘুস, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির অর্থ) দ্বারা ক্রীত পশুর কুরবানীও জায়েয নয়। যেহেতু কুরবানী এক ইবাদত যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা হয়। আর কুরবানীর পশুর মালিক হওয়ার ঐ সমস্ত পদ্ধতি হল পাপময়। আর পাপ দ্বারা কোন প্রকার নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। বরং তাতে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না।” *(মুসলিম ১০১৫নং)*

কুরবানীর পশু নির্ধারণে মুসলিমকে সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত, যাতে পশু সর্বগুণে সম্পূর্ণ হয়। যেহেতু এটা আল্লাহর নিদর্শন ও তা’যীমযোগ্য দ্বীনী প্রতীকসমূহের অন্যতম। যা আত্মসংযম ও তাকওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مَنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ)

অর্থাৎ, এটিই আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করলে এতো তার হৃদয়ের তাকওয়া (ধর্মনিষ্ঠা) সঞ্জাত। *(সূরা হজ্জ ৩২আয়াত)*

এ তো সাধারণ দ্বীনী প্রতীকসমূহের কথা। নির্দিষ্টভাবে কুরবানীর পশু যে এক দ্বীনী প্রতীক এবং তার যত্ন করা যে আল্লাহর সম্মান ও তা’যীম করার শামিল, সে কথা অন্য এক আয়াত আমাদেরকে নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ)

অর্থাৎ, (কুরবানীর) উঁটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম করেছি। *(সূরা হজ্জ ৩৬ আয়াত)*

এখানে কুরবানী পশুর তা’যীম হবে তা উত্তম নির্বাচনের মাধ্যমে। ইবনে আব্বাস ﵄ প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘কুরবানী পশুর সম্মান করার অর্থ হল, পুষ্ট মাংসল, সুন্দর ও বড় পশু নির্বাচন করা।’ *(তফসীর ইবনে কাষীর ৩/২২৯)*

রসূল ﷺ এর যুগে মুসলিমগণ দামী পশু কুরবানীর জন্য ক্রয় করতেন, মোটা-তাজা এবং উত্তম পশু বাছাই করতেন; যার দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর তা’যীম ঘোষণা করতেন। যা একমাত্র তাঁদের তাক্বওয়া, আল্লাহর প্রতি ভীতি ও ভালবাসা থেকে উদ্গত হত। *(ফাতহুল বারী ১০/৯)*

অবশ্য মুসলিমকে এই স্থানে খেয়াল রাখা উচিত যে, মোটা-তাজা পশু কুরবানী করার উদ্দেশ্য কেবল উত্তম মাংস খাওয়া এবং আপোসে প্রতিযোগিতা করা না হয়। বরং উদ্দেশ্য আল্লাহর নিদর্শন ও ধর্মীয় এক প্রতীকের তা’যীম এবং তার মাধ্যমে

আল্লাহর সামীপ্যলাভ হয়।

কালো রঙ অপেক্ষা ধূসর রঙের পশু কুরবানীর জন্য উত্তম। মহানবী ﷺ বলেন, “কালো রঙের দুটি কুরবানী অপেক্ষা ধূসর রঙের একটি কুরবানী আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।” *(আহমাদ, হাকেম, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৬১নং)*

এ পশু ক্রয়ের সময় ত্রুটিমুক্ত দেখা ও তার বয়সের খেয়াল রাখা উচিত। যেহেতু পশু যত নিখুঁত হবে তত আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে, সওয়াবেও খুব বড় হবে এবং কুরবানীদাতার আন্তরিক তাক্বওয়ার পরিচায়ক হবে। কারণ, “আল্লাহর কাছে ওদের (কুরবানীর পশুর) মাংস এবং রক্ত পৌঁছে না, বরং তোমাদের তাক্বওয়া (পরহেযগারী) পৌঁছে থাকে। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর; এ জন্য যে তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। সুতরাং (হে নবী!) তুমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দাও।” *(সূরা হজ্জ ৩৭ আয়াত)*

কুরবানীদাতা কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর তাকে কথা দ্বারা (মুখে বলে) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করবে এবং কুরবানীর দিন তাকে কুরবানীর নিয়তে যবেহ করবে।

যখন কোন পশু কুরবানীর বলে নির্ণীত হয়ে যাবে, তখন তার জন্য কতক আহকাম বিষয়ীভূত হবে। যেমন ঃ-

১। ঐ পশুর স্বত্ব কুরবানীদাতার হাতছাড়া হবে। ফলে তা বিক্রয় করা, হেবা করা, উৎকৃষ্টতর বিনিময়ে ছাড়া পরিবর্তন করা বৈধ হবে না। যেহেতু যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে যেহেতু ওর চেয়ে উৎকৃষ্টতর পশুর বিনিময়ে পরিবর্তন করাতে কুরবানীর মান অধিক বর্ধিত হয়, তাই তা বৈধ। আর ওর চেয়ে মন্দতর পশু দ্বারা পরিবর্তন অবৈধ। কারণ, তাতে কুরবানীর আংশিক পরিমাণ হাতছাড়া হয়।

কুরবানীর পশু নির্দিষ্টকারী ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলেও তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। বরং তার উত্তরাধিকারীগণ তা যবেহ করে ভক্ষণ করবে, দান করবে ও উপঢৌকন দিবে।

২। যদি তার কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে ঐ ত্রুটি বড় না হলে (যাতে কুরবানী মকরূহ হলেও সিদ্ধ হবে। যেমন, কান কাটা, শিং ভাঙ্গা ইত্যাদি) তাই কুরবানী করবে। কিন্তু ত্রুটি বড় হলে (যাতে কুরবানী সিদ্ধ হয় না, যেমন স্পষ্ট খঞ্জতা ইত্যাদি) যদি তা নিজ কর্মদোষে হয়, তাহলে তার পরিবর্তে ত্রুটিহীন পশু কুরবানী

করা জরুরী হবে। আর ঐ ত্রুটিযুক্ত পশুটি তার অধিকারভুক্ত হবে। তবে ঐ ত্রুটি যদি কুরবানীদাতার কর্মদোষে বা অবহেলায় না হয়, তাহলে ওটাই কুরবানী করা তার জন্য সিদ্ধ হবে।

কিন্তু নির্ণয়ের পূর্বে যদি কুরবানী তার উপর ওয়াজেব থাকে, যেমন কেউ কুরবানীর নযর মেনে থাকে এবং তারপর কোন ছাগল তার জন্য নির্ণীত করে এবং তারপর তার নিজ দোষে তা ত্রুটিযুক্ত না হয়ে অন্য কারণে হয়ে থাকে, তা হলেও ত্রুটিহীন পশু দ্বারা তার পরিবর্তন জরুরী হবে।

৩। কুরবানীর পশু হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে, যদি তা কুরবানী দাতার অবহেলার ফলে না হয়, তাহলে তার পক্ষে অন্য কুরবানী জরুরী নয়। কারণ, তা তার হাতে এক প্রকার আমানত, যা যত্ন সত্ত্বেও বিনষ্ট হলে তার যামানত নেই। তবে ভবিষ্যতে ঐ পশু যদি ফিরে পায়, তবে কুরবানীর সময় পার হয়ে গেলেও ঐ সময়েই তা যবেহ করবে। কিন্তু যদি কুরবানী দাতার অবহেলা ও অযত্নের কারণে রক্ষা না করার ফলে হারিয়ে বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য একটি পশু কুরবানী করা জরুরী হবে।

৪। কুরবানীর পশুর কোন অংশ (মাংস, চর্বি, চামড়া, দড়ি ইত্যাদি) বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ, তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তু, তাই কোনও প্রকারে পুনরায় তা নিজের ব্যবহারে ফিরিয়ে আনা বৈধ নয়। তদনুরূপ ওর কোনও অংশ দ্বারা কসাইকে পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু সেটাও এক প্রকার বিনিময় যা ক্রয়-বিক্রয়ের মত। *(বুখারী ১৬৩০, মুসলিম ১৩১৭নং)*

অবশ্য কসাই গরীব হলে দান স্বরূপ অথবা গরীব না হলে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কুরবানীর গোশ্ত্ ইত্যাদি দেওয়া দূষণীয় নয়। যেহেতু তখন তাকে অন্যান্য হকদারদের শামিল মনে করা হবে; বরং সেই অধিক হকদার হবে। কারণ সে ঐ কুরবানীতে কর্মযোগে শরীক হয়েছে এবং তার মন ওর প্রতি আশান্বিত হয়েছে। তবে উত্তম এই যে, তার মজুরী আগে মিটিয়ে দেবে এবং পরে কিছু দান বা হাদিয়া দেবে। যাতে কোন সন্দেহ ও গোলযোগই অবশিষ্ট না থাকে। *(ফাতহুল বারী ৩/৫৫৬)*

৫। পশু ক্রয় করার পর যদি তার বাচ্চা হয়, তাহলে মায়ের সাথে তাকেও কুরবানী করতে হবে। *(তিঃ ১৫০৩নং)* এর পূর্বে ঐ পশুর দুধ খাওয়া যাবে; তবে শর্ত হল, যেন ঐ বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। *(বাইহাকী ৯/২৮৮, আল-মুমতে ৭/৫১০)*

যবেহর নিয়ম-পদ্ধতি

কুরবানী এক ইবাদত। যা তার নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য সময়ে সিদ্ধ হয় না। এই কুরবানীর সময় দশই যুলহজ্জ ঈদের নামাযের পর। নামাযের পূর্বে কেউ যবেহ করলে তার কুরবানী হয় না এবং নামাযের পর ওর পরিবর্তে কুরবানী করা জরুরী হয়।

জুনদুব বিন সুফয়্যান আল-বাজালী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কুরবানীতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন নামায সমাপ্ত করলেন তখন কতক ছাগ ও মেষকে দেখলেন যবেহ করা হয়ে গেছে। অতঃপর বললেন, "যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন ওর পরিবর্তে আর এক পশু যবেহ করে। আর যে ব্যক্তি যবেহ করে নি, সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।" *(বুখারী, মুসলিম ১৯৬০নং)*

ঈদের খুতবায় নবী ﷺ বলেন, "আজকের এই দিন আমরা যা দিয়ে শুরু করব তা হচ্ছে নামায। অতঃপর ফিরে গিয়ে কুরবানী করব। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের সুন্নাহ (তরীকার) অনুবর্তী। আর যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বে) কুরবানী করে নিয়েছে, তাহলে তা মাংসই; যা সে নিজের পরিবারের জন্য পেশ করবে এবং তা কুরবানীর কিছু নয়।" *(বুখারী, মুসলিম ১৯৬১নং)*

আর আফযল এটাই যে, নামাযের পর খুতবা শেষ হলে তবে যবেহ করা। যে ব্যক্তি ভালরূপে যবেহ করতে পারে তার উচিত, নিজের কুরবানী নিজের হাতে যবেহ করা এবং অপরকে তার দায়িত্ব না দেওয়া। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ স্বহস্তে নিজ কুরবানী যবেহ করেছেন। এবং যেহেতু কুরবানী নৈকট্যদানকারী এক ইবাদত, তাই এই নৈকট্য লাভের কাজে অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজস্ব কর্মবলে লাভ করা উত্তম। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, 'আবু মূসা (রাঃ) তাঁর কন্যাদেরকে আদেশ করেছিলেন যে, তারা যেন নিজের কুরবানী নিজের হাতে যবেহ করে।' *(ফাতহুল বারী ১০/১৯)*

পক্ষান্তরে যবেহ করার জন্য অপরকে নায়েব করাও বৈধ। যেহেতু এক সময়ে নবী ﷺ নিজের হাতে তেষট্টিটি কুরবানী যবেহ করেছিলেন এবং বাকী উঁট যবেহ করতে আলী ؓ-কে প্রতিনিধি করছিলেন। *(মুসলিম)*

যবেহ করার সময় বিশেষ লক্ষণীয় ও কর্তব্য ঃ-

১। পশুর প্রতি দয়া করা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। আর তা নিম্ন পদ্ধতিতে সম্ভব;

(ক) সেইরূপ ব্যবস্থা নিয়ে যবেহ করা, যাতে পশুর অধিক কষ্ট না হয় এবং সহজেই সে প্রাণত্যাগ করতে পারে।

(খ) যবেহ যেন খুব তীক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র দ্বারা হয় এবং তা খুবই শীঘ্রতা ও শক্তির সাথে যবেহস্থলে (গলায়) পৌঁচানো হয়।

ফলকথা, পশুর বিনা কষ্টে খুবই শীঘ্রতার সাথে তার প্রাণ বধ করাই উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে দয়ার নবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।” *(মুসলিম ১৯৫৫নং)*

বধ্য পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া উচিত নয় (মকরূহ)। যেহেতু নবী ﷺ ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।” *(মুসনাদ আহমাদ ২/১০৮, ইবনে মাজাহ ৩১৭২নং, সহীহ তারগীব ১/৫২৯)*

আর যেহেতু পশুর চোখের সামনেই ছুরি ধার দেওয়ায় তাকে চকিত করা হয়; যা বাঞ্ছিত অনুগ্রহ ও দয়াশীলতার প্রতিকূল।

তদনুরূপ এককে অপরের সামনে যবেহ করা এবং ছেঁচড়ে যবেহস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়াও মকরূহ।

২। কুরবানী যদি উঁট হয়, (অথবা এমন কোন পশু হয় যাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়), তাহলে তাকে বাম পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে নহর করা হবে। আল্লাহ পাক বলেন, “সুতরাং দন্ডায়মান অবস্থায় ওদের যবেহকালে তোমরা আল্লাহর নাম নাও।” *(কুঃ ২২/৩৬)* ইবনে আব্বাস ﷺ এই আয়াতের তফসীরে বলেন, ‘বাম পা বেঁধে তিন পায়ের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় (নহর করা হবে)।’ *(তাফসীর ইবনে কাষীর)*

যদি উঁট ছাড়া অন্য পশু হয় তাহলে তা বামকাতে শয়নাবস্থায় যবেহ করা হবে। যেহেতু তা সহজ এবং ডান হাতে ছুরি নিয়ে বাম হাত দ্বারা মাথায় চাপ দিয়ে ধরতে সুবিধা হবে। তবে যদি যবেহকারী নেটা বা বেঁয়ো হয় তাহলে সে পশুকে ডানকাতে শুইয়ে যবেহ করতে পারে। যেহেতু সহজ উপায়ে যবেহ করা ও পশুকে আরাম

দেওয়াই উদ্দেশ্য।

পশুর গর্দানের এক প্রান্তে পা রেখে যবেহ করা মুস্তাহাব। যাতে পশুকে অনায়াসে কাবু করা যায়। কিন্তু গর্দানের পিছন দিকে পা মুচড়ে ধরা বৈধ নয়। কারণ, তাতে পশু অধিক কষ্ট পায়।

৩। যবেহকালে পশুকে কেবলামুখে শয়ন করাতে হবে। *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ২/১০৪৩, হাদীসটির সনদে সমালোচনা করা হয়েছে)* অন্যমুখে শুইয়েও যবেহ করা সিদ্ধ হবে। যেহেতু কেবলামুখ করে শুইয়ে যবেহ করা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে কোন শুদ্ধ প্রমাণ নেই। *(আহকামুল উযহিয়্যাহ ৮৮,৯৫পৃঃ)*

৪। যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া (‘বিসমিল্লাহ’ বলা) ওয়াজেব। আল্লাহ তাআলা বলেন, “যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহের বিশ্বাসী হও তবে যাতে (যে পশুর যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা আহার কর।” *(কুঃ ৬/১১৮)* “এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা হতে তোমরা আহার করো না; উহা অবশ্যই পাপ।” *(কুঃ ৬/১২১)*

আর নবী ﷺ বলেন, “যা খুন বহায় এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর।” *(বুখারী ২৩৫৬, মুসলিম ১৯৬৮নং)*

‘বিসমিল্লাহ’র সাথে ‘আল্লাহু আকবার’ যুক্ত করা মুস্তাহাব। অবশ্য এর সঙ্গে কবুল করার দুআ ছাড়া অন্য কিছু অতিরিক্ত করা বিধেয় নয়। অতএব (কুরবানী কেবল নিজের তরফ থেকে হলে) বলবে, ‘**বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিন্‌কা অলাক, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী।**’

নিজের এবং পরিবারের তরফ থেকে হলে বলবে,‘---**তাক্বাব্বাল মিন্নী অমিন আহলে বাইতী।**’ অপরের নামে হলে বলবে, ‘---**তাক্বাব্বাল মিন** (এখানে যার তরফ থেকে কুরবানী তার নাম নেবে)। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৩৬পৃঃ)*

এই সময় নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা বিধেয় নয়; বরং তা বিদআত। *(আল-মুমতে ৭/৪৯২)* যেমন ‘**বিসমিল্লাহ**’র সাথে ‘**আর-রাহমানির রাহীম**’ যোগ করাও সুন্নত নয়। যেহেতু এ সম্বন্ধে কোন দলীল নেই। যেমন যবেহ করার লম্বা দুআ ‘ইন্নী অজ্জাহ্‌তু’ এর হাদীস যয়ীফ। *(যয়ীফ আবূ দাউদ ৫৯৭নং)*

যবেহর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ‘**বিসমিল্লাহ**’ পাঠ জরুরী। এর পর যদি লম্বা ব্যবধান পড়ে যায়, তাহলে পুনরায় তা ফিরিয়ে বলতে হবে। তবে ছুরি ইত্যাদি হাতে নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়ায় যেটুকু ব্যবধান পড়ে তাতে ‘**বিসমিল্লাহ**’ ফিরিয়ে পড়তে হয় না।

আবার '**বিসমিল্লাহ**' শুধু সেই পশুর জন্যই পরিগণিত হবে যাকে যবেহ করার সঙ্কল্প করা হয়েছে। অতএব এক পশুর জন্য '**বিসমিল্লাহ**' পড়ে অপর পশু যবেহ বৈধ নয়। বরং অপরের জন্য পুনরায় '**বিসমিল্লাহ**' পড়া জরুরী। অবশ্য '**বিসমিল্লাহ**' বলার পর অস্ত্র পরিবর্তন করাতে আর পুনরায় পড়তে হয় না।

প্রকাশ যে, যবেহর পর পঠনীয় কোন দুআ নেই।

৫। যবেহতে খুন বহা জরুরী। আর তা দুই শাহরগ (কন্ঠনালীর দুই পাশে দু'টি মোটা আকারের শিরা) কাটলে অধিকরূপে সম্ভব হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যা খুন বহায়, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর। তবে যেন (যবেহ করার অস্ত্র) দাঁত বা নখ না হয়।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, সহীহুল জামে' ৫৫৬৫নং)*

সুতরাং রক্ত প্রবাহিত ও শুদ্ধ যবেহ হওয়ার জন্য চারটি অঙ্গ কাটা জরুরী; শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বস্থ দুই মোটা শিরা।

৬। প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে পশুর অন্য কোন অঙ্গ কেটে কষ্ট দেওয়া হারাম। যেমন ঘাড় মটকানো, পায়ের শিরা কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি জান যাওয়ার আগে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে দেহ আড়ষ্ট হয়ে এলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করার পর যদি পুনরায় লাফিয়ে ওঠে তাহলে আরো কিছুক্ষণ প্রাণ ত্যাগ করা কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যেহেতু অন্যভাবে পশুকে কষ্ট দেওয়া আদৌ বৈধ নয়।

পশু পালিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলেও ঘাড় মটকানো যাবে না। বরং তার বদলে কিছুক্ষণ ধরে রাখা অথবা (হাঁস-মুরগীকে ঝুড়ি ইত্যাদি দিয়ে) চেপে রাখা যায়।

যবেহ করার সময় পশুর মাথা যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তার খেয়াল রাখা উচিত। তা সত্ত্বেও যদি কেটে বিচ্ছিন্ন হয়েই যায়, তাহলে তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

যবাই করে ছেড়ে দেওয়ার পর (অসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে) কোন পশু উঠে পালিয়ে গেলে তাকে ধরে পুনরায় যবাই করা যায়। নতুবা কিছু পরেই সে এমনিতেই মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। আর তা হালাল।

প্রকাশ থাকে যে, যবেহ করার জন্য পবিত্রতা বা যবেহকারীকে পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। যেমন মাথায় টুপী রাখা বা মাথা ঢাকাও বিধিবদ্ধ নয়। অবশ্য বিশ্বাস ও ঈমানের পবিত্রতা জরুরী। সুতরাং কাফের, মুশরিক (মাযার বা কবরপূজারী) ও বেনামাযীর হাতে যবেহ শুদ্ধ নয়।

যেমন যবেহ করার আগে কুরবানীর পশুকে গোসল দেওয়া, তার খুর ও শিঙে

তেল দেওয়া অথবা তার অন্য কোন প্রকার তোয়ায করা বিদআত।

প্রকাশ থাকে যে, যবেহকৃত পশুর রক্ত হারাম। অতএব তা কোন ফললাভের উদ্দেশ্যে পায়ে মাখা, দেওয়ালে ছাপ দেওয়া বা তা নিয়ে ছুড়াছুড়ি করে খেলা করা বৈধ নয়।

কুরবানীর দিনের ফযীলত ও তার অযীফাহ

কুরবানীর দিন এক মহান দিন। এই দিনকে 'হজ্জে আকবার' এর দিন বলা হয়। *(আবূ দাঊদ ৫/৪২০, ইবনে মাজাহ ২/১০১৬)*

এই দিন সারা বছরের শ্রেষ্ঠতম দিন। নবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর নিকট মহানতম দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর স্থিরতার (কুরবানীর পরের) দিন। *(আবূ দাঊদ ৫/১৭৪, মিশকাত ২/৮১০)*

কুরবানীর ঈদ বা ঈদুল আযহা, রোযার ঈদ বা ঈদুল ফিতর অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ঈদুল আযহাতে নামায ও কুরবানী আছে। কিন্তু ঈদুল ফিতরে আছে নামায ও সদকাহ। আর কুরবানী সদকাহ অপেক্ষা উত্তম। আবার কুরবানীর দিনে হাজীদের জন্য স্থান ও কালের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা একত্রিত হয়। যেহেতু ঐ সময় পবিত্র কাবাগৃহের হজ্জ হয়। আর যার পূর্বে আরাফার দিন ও পরে তাশরীকের তিন দিন। আর এই দিনগুলির প্রত্যেকটাই হাজীদের জন্য ঈদ। *(লাতায়েফুল মাআরিফ ৩১৮পৃঃ)*

এই দিনে কতকগুলি পালনীয় অযীফাহ রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপঃ-

১। ঈদগাহের প্রতি বহির্গমন ঃ-

এই দিনে সুন্দর পোষাক ও বেশ-ভুষায় সজ্জিত হয়ে উত্তম খোশবু মেখে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত। যেহেতু এই দিন সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার দিন। যেমন ঈদের জন্য গোসল করা কিছু সলফ, সাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক শুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে। *(ফাতহুল বারী ২/৪৩৯, মুগনী ৩/২৫৬)*

খুবই সকাল সকাল ঈদগাহে পৌঁছে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসার চেষ্টা করবে মুসলিম। এতে নামাযের জন্য প্রতীক্ষার সওয়াব লাভ করবে।

ঈদগাহে যাবার পথে তকবীর পাঠ করবে। ইমাম বের হওয়া (নামাযে দাঁড়ানো)

পর্যন্ত ঐ তকবীর পড়া সুন্নত। যুহরী বলেন, লোকেরা ঈদের সময় তকবীর পাঠ করত, যখন ঘর হতে বের হত তখন থেকে শুরু করে ঈদগাহ পর্যন্ত পথে এবং ইমাম বের হওয়া পর্যন্ত ঈদগাহে তকবীর পড়ত। ইমামকে (নামাযে দাঁড়াতে) দেখে সকলেই চুপ হয়ে যেত। পুনরায় ইমাম যখন (নামাযের) তকবীর পড়তেন তখন আবার সকলে তকবীর পড়ত। *(ইবনে আবী শাইবাহ ২/ ১৬৫, ইরওয়াউল গলীল ৩/ ১২১)*

সকলেই এই তকবীর উচ্চস্বরে পাঠ করবে। তবে একই সঙ্গে সমস্বরে তকবীর পাঠ বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিতরের চেয়ে ঈদুল আযহার তকবীর অধিকরূপে তাকীদপ্রাপ্ত। *(মাজমূ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২২১)*

ঈদগাহে পাঁয়ে হেঁটে যাওয়াই সুন্নত। অবশ্য ঈদগাহ দূর হলে অথবা অন্য কোন ওজর ও অসুবিধার ক্ষেত্রে সওয়ার হয়েও যাওয়া চলে। *(মুগনীঃ ৩/২৬২)*

ঈদুল আযহার দিন নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া সুন্নত। আর ঈদুল ফিতরের দিন ইদগাহে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নত। *(তিরমিযী ৩/৯৮, ইবনে মাজাহ ১/২৯২)*

ইবনুল কাইয়েম বলেন, 'তিনি ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে (কুরবানী করে) কুরবানীর (গোশ্ত) খেতেন।' *(যাদুল মাআদ ১/৪৪১)*

প্রকাশ থাকে যে, ঈদুল আযহার দিনে নামাযের পূর্বে না খাওয়ার নাম হাফ রোযা নয়। আর এই রোযার জন্য ফজরের পূর্বে সেহরী খাওয়াও বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে জানা কথা যে, হাফ বলে কোন রোযা শরীয়তে নেই এবং ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম।

২। ঈদের নামায ঃ-

এই নামায সুন্নতে মুআক্কাদা। কোন সক্ষম মুসলিমের জন্য তা ত্যাগ করা বা আদায় করতে অবহেলা করা উচিত নয়। শিশুদেরকেও এই নামাযে উপস্থিত হতে উদ্বুদ্ধ করবে। সৌন্দর্য প্রকাশ না হলে, পর্দার রীতি থাকলে এবং পথে ও ঈদগাহে নারী-পুরুষে মিলা-মিশার ভয় না থাকলে মহিলারা জামাআতে শামিল হবে। বরং পর্দার ব্যবস্থা করে ঈদগাহে মহিলাদেরকে উপস্থিত হয়ে নামায পড়ার বন্দোবস্ত করা জরুরী। যাতে ঋতুবতী মহিলারাও নামাযে না হলেও দুআ ও খুশীতে শরীক হবে। এ ছাড়া পৃথকভাবে কেবল মেয়েদের জন্য কোন বাড়িতে বা মসজিদে ঈদের নামাযের কথা শরীয়তে উল্লেখিত নেই।

অনেক ওলামা যেমন, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়েম, শওকানী, সিদ্দীক হাসান খান প্রভৃতিগণের মতে এই নামায ওয়াজেব।

ঈদের নামাযের জামাআত ছুটে গেলে একাকী দুই রাকআত নামায পড়ে নেবে। *(ফাতহুল বারী ২/৪৭৪)* ঈদের খুতবাহ শোনা সুন্নত। তবে উপস্থিত থেকে তাতে লাভবান হওয়া উচিত। খুতবাহ শেষে (যে পথে গিয়েছিল তার) ভিন্ন পথে বাড়ি ফিরবে। *(বুখারী ৯৪৩নং)*

৩। কুরবানী যবেহ ও গোশ্ত্ বিতরণ ঃ-

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে কুরবানী যবেহর সময় ঈদের খুতবা শেষ হলে শুরু হয়। কুরবানী দাতার জন্য সুন্নত যে, সে তা হতে খাবে, আত্মীয়-স্বজনকে (তারা কুরবানী দিক, চাই না দিক) হাদিয়া দেবে এবং গরীবদেরকে সদকাহ করবে। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে বলেন,

(فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ)

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা তা হতে ভক্ষণ কর এবং নিঃস্ব অভাবগ্রস্তদেরকে ভক্ষণ করাও। *(সূরা হাজ্জ ২৮ আয়াত)*

{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

অর্থাৎ, আর (কুরবানীর) উঁটকে করেছি আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় ওগুলির উপর (নহর করার সময়) তোমরা আল্লাহর নাম নাও। অতঃপর যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে। এইভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *(সূরা হাজ্জ ৩৬ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, (কুরবানীর গোশ্ত) তোমরা খাও, জমা কর, এবং দান কর।" তিনি আরো বলেন, "তা খাও, খাওয়াও এবং জমা রাখ।" *(মুসলিম ১৯৭১নং)*

উপর্যুক্ত আয়াত বা হাদীসে খাওয়া, হাদিয়া দেওয়া ও দান করার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিবৃত হয়নি। তবে অধিকাংশ উলামাগণ মনে করেন যে, সমস্ত মাংসকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খাওয়া, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেওয়া এবং এক ভাগ গরীবদেরকে দান করা উত্তম।

কেউ চাইলে সে তার কুরবানীর সমস্ত গোশ্তকে বিতরণ করে দিতে পারে। আর তা

করলে উক্ত আয়াতের বিরোধিতা হবে না। কারণ, ঐ আয়াতে নিজে খাওয়ার আদেশ হল মুস্তাহাব বা সুন্নত। সে যুগের মুশরিকরা তাদের কুরবানীর গোশ্‌ত খেত না বলে মহান আল্লাহ উক্ত আদেশ দিয়ে মুসলিমদেরকে তা খাবার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ খাওয়া ওয়াজেবও বলেছেন। *(তফসীর ইবনে কাষীর ৩/২৯২, ৩০০, মুগনী ১৩/৩৮০, মুমতে ৭/৫২৫)* সুতরাং কিছু খাওয়াই হল উত্তম।

কুরবানীর গোশ্‌ত হতে কাফেরকে তার অভাব, আত্মীয়তা, প্রতিবেশ অথবা তাকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার জন্য দেওয়া বৈধ। আর তা ইসলামের এক মহানুভবতা। *(মুগনী ১৩/ ৩৮১, ফাতহুল বারী ১০/৪৪২)*

তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি মনসুখ (রহিত) হলেও যেখানে দুর্ভিক্ষ থাকে সেখানে তিন দিনের অধিক গোশ্‌ত জমা রাখা বৈধ নয়। *(ফাতহুল বারী ১০/২৮, ইনসাফ ৪/ ১০৭)*

কুরবানীদাতা পশু যবেহ করার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটতে পারে। তবে এতে কুরবানী দেওয়ার সমান সওয়াব লাভ হওয়ার কথা ঠিক নয়। যেমন কুরবানী দিতে না পারলে মুরগী কুরবানী দেওয়া বিদআত।

আর দাড়ি কোন সময়কার জন্য চাঁছা বৈধ নয়। কিন্তু বহু মানুষ আছে যারা কুরবানী করার সাথে সাথে নিজের দাড়িও কুরবানী (?) করে থাকে! কেউ কেউ তো নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই দাড়ি চেঁছে সাজ-সজ্জা করে। অথচ সে এ কাজ ক'রে তিনটি পাপে আলিপ্ত হয়ঃ (১) দাড়ি চাঁচার পাপ (২) পাপ কাজের মাধ্যমে ঈদের জন্য সৌন্দর্য অর্জন করার পাপ এবং (৩) কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে চুল (দাড়ি) কাটার পাপ। *(সালাতুল ঈদাইন, আলবানী ৪০পৃঃ)*

অনুরূপভাবে অধিকাংশ দাড়ি-বিহীন হাজীদেরকে দেখা যায় যে, তারা ইহরামের কারণে দাড়ি কিছু বাড়িয়ে থাকে। অতঃপর যখন হালাল হবার সময় হয়, তখন মাথার কেশ মুন্ডনের পরিবর্তে তারা তাদের দাড়ি মুন্ডন করে থাকে! অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ কেশ মুন্ডন করতে উৎসাহিত করেছেন এবং দাড়ি বর্ধন করতে আদেশ করেছেন। অতএব 'ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেউন।'

পরন্তু এই অপকর্মে কয়েকটি বিরুদ্ধাচরণ রয়েছে। (১) দাড়ি বর্ধনের উপর রসূলের আদেশ উল্লংঘন এবং তাতে তাঁর বিরোধিতা। (২) কাফেরদের প্রতিরূপ ধারণ। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য ধারণ করে সে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত।" (৩) নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন। অথচ তিনি নারীদের

আকৃতি ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন। (৪) (আল্লাহর বিনা অনুমতিতে) আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন এবং শয়তানের প্রতিজ্ঞার আনুগত্য। যেহেতু সে আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে; যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (١١٨) وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً} (١١٩)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন। সে (শয়তান) বলে, 'আমি তোমার বান্দাদের একটা নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই, তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই, এবং তাদেরকে অবশ্যই নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। *(সূরা নিসা ১১৮-১১৯ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, দাড়ি রাখা সকল নবীর সুন্নত (তরীকা)। আর তা মৌলবী-অমৌলবী ও হাজী-অহাজী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব। কেউ দাড়ি না রাখলে, তার কাবীরা গোনাহ হবে।

৪। ঈদের মুবারকবাদ ঃ-

ঈদের দিন এক অপরকে মুবারকবাদ দেওয়ায় ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে কোন দোষ নেই। যেমন, '**তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিনকুম**' (আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নিকট থেকে ইবাদত কবুল করেন), ঈদ মুবারক ইত্যাদি দুআমূলক বাক্য বলে এক অপরের সাথে সাক্ষাৎ করা বৈধ। যেহেতু ঈদে ও অন্যান্য খুশীতে মুবারকবাদ দেওয়া, বর্কত, মঙ্গল ও কবুলের দুআ করা) ইসলামে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

যেমন, সাহাবাগণ ঈদগাহ হতে ফিরার সময় এক অপরকে বলতেন, '**তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিনক্**। *(হাবী ১/৮২, ফাতহুল বারী ২/৪৪৬, তামামুল মিন্নাহ ৩৫৪পৃঃ)*

অন্যান্য খুশীর বিষয়ে মুবারকবাদ দেওয়ার ব্যাপারেও ইসলামে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন আনাস ﷺ বলেন, (বিজয়ের খবর নিয়ে) যখন "---এ এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন---" এই আয়াতটি *(কুঃ*

৮৮/২) হুদাইবিয়া থেকে ফিরার পথে নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হল তখন তিনি বললেন, “আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা ধরাপৃষ্ঠে সমগ্র বস্তু থেকে আমার নিকট প্রিয়তম।” অতঃপর তিনি তাঁদের (সাহাবাদের) কাছে তা পড়ে শুনালেন। তা শুনে সাহাবাগণ বললেন, ‘যে জিনিস আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তার উপর আপনাকে মুবারকবাদ---।’ *(বুখারী ৩৯৩৯, মুসলিম ১৭৮৬নং)*

অনুরূপভাবে যখন কা’ব বিন মালেক ﷺ-এর তওবা কবুল হল তখন তাঁকে মুবারকবাদ দেওয়া হয়েছিল। *(বুখারী ৪১৫৬, মুসলিম ২৭৬৯নং)*

বিবাহ-শাদীতে আল্লাহর রসূল ﷺ ‘বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলাইক---’ বলে বরকে মুবারকবাদের দুয়া দিতেন। *(বুখারী ৪৮৬০, মুসলিম ১৪২৭নং)*

অবশ্য ঈদের খুশীতে মুবারকবাদ দেওয়ার ব্যাপারে নবী ﷺ কর্তৃক কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। তবে কিছু সাহাবা ও তাবেয়ীন হতে এ কথা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত আছে। অতত্রব কেউ এ কাজ করলে করতেও পারে এবং ছাড়লে ছাড়তেও পারে। *(মাজমূ ফাতাওয়া ২৪/২৫৩)*

শায়খ আব্দুর রহমান সা’দী বলেন, ‘বিভিন্ন উপযুক্ত শুভক্ষণে মুবারকবাদ শরীয়তের এক ফলপ্রসূ বৃহৎ মূলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, যাবতীয় কথা ও কাজের দেশাচার ও প্রথার মৌলিক মান হচ্ছে বৈধতা। অতএব কোন আচার বা প্রথাকে হারাম বলা যাবে না; যতক্ষণ না ঐ প্রথা বা আচারকে শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অথবা তাতে কোন বিঘ্ন বা ক্ষতি প্রকাশিত না হয়েছে। এই মহান মৌলনীতির সপক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর সমর্থনও রয়েছে।

সুতরাং লোকেরা এই মুবারকবাদকে কোন ইবাদত বলে মনে করে না। বরং তা একটা প্রচলিত রীতি মনে করে; যাতে শুভক্ষণে খুশির সাথে এক অপরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে থাকে এবং তাতে কোন বাধা বা বিঘ্নও নেই। বরং তাতে উপকারই আছে; যেমন মুসলিমরা এক অপরকে এর মাধ্যমে উপযুক্ত দুআ দিয়ে থাকে এবং তাতে আপোসে সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও সম্প্রীতি সঞ্চার ও বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই রীতির সাথে যখন কোন লাভ ও মঙ্গল যুক্ত হয় তখন তা তার ফল হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। *(ফাতাওয়া সা’দিয়্যাহ ৪৮৭পৃঃ, হাবী ১/৭৯)*

৫। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ ঃ-

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও জ্ঞাতি-বন্ধনের দাবী এই যে, বিশেষ করে ঈদের দিন

তাদের যিয়ারত করা। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা, ঈদের খুশী ও সুখে তাদের শরীক হওয়া। পিতামাতা থেকে পৃথক থাকলে (বা এক বাড়িতে না থাকলে) তাদের যিয়ারত পুত্রের জন্য সুনিশ্চিত হয়। অতঃপর আত্মীয়-স্বজনদের যিয়ারত ও তার পর দ্বীনী ভাই-বন্ধুদের যিয়ারত করা কর্তব্য। সুতরাং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের যিয়ারতকে পিতা-মাতার যিয়ারতের উপর প্রাধান্য দেওয়া আদৌ বৈধ নয়।

যেমন, এই যিয়ারতে বেগানা নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর অবাধ মিলামিশা, পর্দাহীনতা, নারীদের নানান সাজ-সজ্জা ও অঙ্গরাগে সুগন্ধ মেখে গায়ের মাহরাম (গম্য) পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ ও মুসাফাহাহ করা, খেলা, ছবি তোলা ইত্যাদি হারাম।

জ্ঞাতি-বন্ধন জাগরূক রাখার জন্য ঈদ এক বড় শুভপর্ব। যেদিন প্রায় সকলের মুখে হাসির ফুলকুঁড়ি ফুটে ওঠে। কিন্তু এমন অনেক মানুষ থাকে, যাদের সে হাসি ওষ্ঠাধরে পৌছনোর পূর্বে হৃদয় মাঝেই বিলীন হয়ে যায়। তারা খুশীর স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হয় না। বরং মনঃকষ্টে অনেকের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়। এমন লোকদেরকে বেছে তাদের হাসি ফুটিয়ে তুলতে সহযোগিতা করা এক মহান কাজ। ঐ দিনে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর কোন অনাথ, এতীম, দুঃস্থ, দাস-দাসী, বিধবা অভাগিনীদের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ উপলক্ষে তাদেরকে কিছু উপহার দিয়ে সান্ত্বনা দান মহৎ লোকের কাজ।

৬। ঈদের দিন সৎকাজ করা ও তার শুক্র (কৃতজ্ঞতা) আদায় করার দিন। অতএব ঐ দিনকে গর্ব, অহংকার, নজরবাজি, তাসবাজি, আতশবাজি ও অন্যান্য অবৈধ খেলা, সিনেমা বা অবৈধ ফিল্ম্ দর্শন, গান-বাজনা করা ও শোনা, মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতির মাধ্যমে অবৈধ হর্ষোৎফুল্ল দিন বানানো কোন মুসলিমের জন্য আদৌ উচিত নয়। নচেৎ নেক আমলের শুকরিয়া আদায়ের বদলে কৃত আমলের ফলই নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য এই পবিত্র খুশির দিনে ছোট শিশু কন্যারা ‘দুফ’ (ঢপঢপে আওয়াজবিশিষ্ট একমুখো ঢোলক) বাজিয়ে মার্জিত বৈধ গজল ইত্যাদি গাইতে পারে।

সতর্কতার বিষয় যে, বিশেষ করে ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর পিতামাতা বা কোন আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারতের প্রথা ইসলামে নেই। এ অভ্যাসটিকে কর্তব্য মনে করলে নিঃসন্দেহে তা বিদআত হবে। *(আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২৫৮পৃঃ)*

তাশরীকের দিনসমূহের ফযীলত

১১, ১২, ১৩ই যুলহজ্জকে 'আইয়্যামে তাশরীক' বলা হয়। তাশরীকের অর্থ হল, রৌদ্রে গোশ্ত্ শুকানো। যেহেতু এই দিনগুলিতে কুরবানীর গোশ্ত্ বেশী দিন রাখার জন্য রৌদ্রে শুকানো হত, তাই উক্ত দিনগুলির এই নামকরণ হয়।

এ দিনগুলিও শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ দিনসমূহের অন্যতম; যে মহান কাল-সময়ে আল্লাহ পাক তাঁর যিক্র করতে আদেশ করেছেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২০৩ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আইয়্যামে মা'লূমাত' (বিদিত দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, (যুলহজ্জের) দশ দিন এবং 'আইয়্যামে মা'দূদাত' (নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, তাশরীকের (কুরবানী ঈদের পরের তিন) দিনসমূহ। আর এই ব্যাখ্যা অধিকাংশে উলামার। *(ফাতহুল বারী ২/৪৫৮, লাতায়িফুল মাআরিফ ৩২৯পৃঃ)*

মুফাস্সির কুরতুবী বলেন, 'উলামাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, 'আইয়্যামে মা'দূদাত' এর উদ্দেশ্য মিনার দিনসমূহ এবং তাই তাশরীকের দিন। আর এই তিনটি নাম ঐ দিনগুলির জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এই আয়াতে যিক্র করার আদেশ নিয়ে হাজী-অহাজী নির্বিশেষে সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর বিশেষ করে নামাযসমূহের সময়ে নামাযীকে - একাকী হোক অথবা জামাআতে- যিক্র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কথার উপর সাহাবা ও তাবেয়ীনদের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত।' *(তফসীর কুরতুবী ৩/ ১,৩)*

রসূল ﷺ বলেছেন, "তাশরীকের দিনগুলি পান-ভোজনের ও যিক্র করার দিন।" *(মুসলিম ১১৪১নং)*

তিনি আরো বলেছেন, (যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ।" আর "আল্লাহর নিকট সর্বমহান দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর তাশরীকের (ঈদের দ্বিতীয়) দিন।"

আইয়্যামে তাশরীক শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ দিন। যেহেতু এ দিনগুলি যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের সংলগ্নেই পড়ে; যার ফযীলত এই পুস্তিকার প্রারম্ভে আলোচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এই দিনগুলিতে হজ্জের কিছু আমল পড়ে, যেমন রম্ই, তওয়াফ ইত্যাদি। যাতে মূল শ্রেষ্ঠত্বে ঐ দিনগুলির সাথে মিলিত হয়। যেমন তকবীর বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে দুই প্রকারের দিনগুলিই সম্পৃক্ত।

উপর্যুক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, তাশরীকের দিনগুলিও পান-ভোজনের দিন। আনন্দ ও খুশী করার, আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষাৎ করার এবং বন্ধু-বান্ধব মিলে ফলপ্রসূ বৈঠক করার দিন। এই দিনগুলিতে অধিকরূপে উত্তম পানাহার; বিশেষ করে মাংস ব্যবহার করা দূষণীয় নয়। তবে তাতে যেন কোন প্রকারের অপচয়, নষ্ট ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা না হয়।

এই দিনগুলি আল্লাহকে বিশেষভাবে স্মরণ ও তার যিক্র করার দিন। এই যিক্র হবে বিবিধ প্রকারেরঃ-

১। প্রতি ফরয নামাযের পর তকবীর পাঠ। যা তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত পড়তে হয়। অবশ্য অনেক উলামাগণ মনে করেন যে, তকবীর কেবল নামাযের পরেই সুনির্দিষ্ট নয়। বরং এই দিনগুলিতে যে কোন সময় সর্বদা পড়াই উত্তম।

অভিমতটি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলিকে যিক্র দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন। কিন্তু তাতে কোন নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করেন নি। তিনি বলেন, "এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহর যিক্র কর।" *(সূরা বাক্বারাহ ২০৩ আয়াত)* আর এই আদেশ হাজী-অহাজী সকলের জন্য সাধারণ। তদনুরূপ রসূল ﷺ ও বলেন, "এই দিনগুলি আল্লাহর যিক্র করার দিন।" অতএব এই নির্দেশ পালন স্পষ্টভাবে তখনই সম্ভব হয় যখন তকবীরাদি সর্বাবস্থায় (যে অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা চলে) পাঠ করা হয়। যেমন, নামাযের পরে, মসজিদে, বাড়িতে, পথে, মাঠে ইত্যাদিতে। *(নাইলুল আওতার ৩/৩৫৮)*

২। কুরবানী যবেহ করার সময় তাসমিয়াহ ও তাকবীর পাঠ।

৩। পান ও ভোজনের পর যিক্র ও দুআ। যেহেতু দিনগুলি অধিক রূপে খাওয়া ও পান করার দিন, যাতে পূর্বে আল্লাহর নাম ও পরে তার প্রশংসা করায় যিক্র হয়।

৪। (হাজীদের জন্য) রম্ই জিমার করার সময় তকবীর পাঠ।

সুতরাং মুসলিমকে গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। তার উচিত, এই সময়গুলিতে আল্লাহর যিক্র ও নেক আমল দ্বারা আবাদ করা। নচেৎ আল্লাহ-ভোলা মানুষদের মত ফালতু বেশী বেশী রাত্রি জেগে কোন বিলাস ও প্রমোদ যন্ত্রের সম্মুখে বসে শুক্রিয়ার পরিবর্তে পাপ করা আদৌ উচিত নয়।

অধিক খেয়ে-পান করে আল্লাহর যিক্র ও ইবাদতে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর নিয়ামতের এক প্রকার শুকরিয়া আদায় করা হয়। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দ্বারা উদরপূর্তি করে তার অবাধ্যাচরণ ও পাপকাজে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর

অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আর তাঁর দেওয়া সম্পদকে অস্বীকার করলে এবং তাঁর কৃতঘ্নতা করলে কখনো তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে সম্পদ অধিকরূপে বর্ধমান হতে থাকে।

যেহেতু তাশরীকের দিনগুলিকেও ঈদ বলা হয়েছে, তাই তাতে কোন প্রকারের রোযা পালন করা শুদ্ধ নয়। কারো অভ্যাসমত যদিও এই দিনগুলিতে রোযা পড়ে, তবুও তার পরবর্তী কোন দিনে রেখে নেবে এবং এই দিনগুলিতে খান-পানের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্র করবে। *(লাতায়িফুল মাআরিফ ৩৩৩পৃঃ)*

অবশ্য যে তামাত্তু হজ্জের হাজী কুরবানী দিতে সক্ষম না হয়, সে এই দিনগুলিতে তিনটি রোযা পালন করবে কিনা তা নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকে বলেন, 'কেবল ঐ হাজী রোযা রাখবে। কারণ আল্লাহ বলেন, "অতএব যে ব্যক্তি (কুরবানী) না পায় সে হজ্জে তিনটি রোযা (পালন করবে)। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৬ আয়াত)* আর 'হজ্জে' বলতে কুরবানীর পূর্বের ও পরের দিনকেও বুঝায়।' পরন্তু ইবনে উমার ﷺ এবং আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, 'কুরবানী দিতে অক্ষম এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখার অনুমতি নেই।' *(বুখারী ১৮৯৮, ফাতহুল বারী ৪/২৪৩, নাইলুল আওতার ৪/২৯৪)*

তাশরীকের দিনগুলিতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। তাই সর্বমোট চার দিন কুরবানী বৈধ। যেহেতু তাশরীকের দিন, কুরবানীর পরের তিন দিনকে বলা হয়। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৫/৪১২, আল-মুমতে ৭/৪৯৯)* আর নবী ﷺ বলেন, "তাশরীকের সমস্ত দিনগুলিতেই যবেহ করা যায়।" *(আহমাদ ৪/৮২, বাইহাকী ৯/২৯৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/৬১৭)* যেমন দিনের বেলায় সুযোগ না হলে রাতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। *(আল-মুমতে ৭/৫০৩)* রাতে কুরবানী যবেহ করার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়। *(মাযাঃ ৪/২৩)* আর নামাযের নিষিদ্ধ সময়গুলোতে কুরবানী যবেহ করা নিষিদ্ধ নয়।

সমাপ্ত

